ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ।

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসু ঠাকুর

প্রণীত।

ঢাকা নয়াবাজার হইতে—

শ্রীনরেন্দ্র নাথ ভদ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২০ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ৸০ বার আনা।

প্রাপ্তিস্থান।

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়। আশক গলি, ঢাকা

গ্রন্থকারের নিকট। ১৮নং, রজনী বস্থর লেন, ঢাকা।

"প্রতিভা" কার্য্যালয়। ঢাকা।

"ঢাকা রিভিউ" কার্য্যালয়। নয়াবাজার, ঢাকা।

এতদ্ভিন্ন ঢাকা ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

উৎসর্গ।

—*—

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।

দ্বন্দাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্॥

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং।

ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বং নমামি॥"

শ্রীশ্রীগুরুসমর্পণমস্তু।

First four formes printed by Sheikh Ansar Ali at the East Bengal Printing and Publishing House, last four formes at the Ramsundar Steam Machine Press, Dacca.

ভূমিকা।

গত ১৯১২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্থানীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহার্থ আমরা ভাওয়াল, কাশীমপুর, তালিপাবাদ, চাঁদপ্রতাপ, প্রভৃতি পরগণার বহু স্থানে ভ্রমণ করি। এখন ইহার অধিকাংশ স্থানই মনুষ্যবসতিশূন্য এবং শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় বনাকীর্ণ। কিন্তু ইহার অন্তরালে বহু শতাব্দীর প্রাচীনকীর্ত্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান আছে। হিউয়েন্থ্ সাঙ্ এর বর্ণিত সমতট এবং কামরূপ রাজ্যের বহু বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষ এই অরণ্যানীতেই বর্ত্তমান আছে, এইরূপ অনুমিত হয়; এবং এমন কি এই প্রদেশে মৌর্য্যসম্রাট অশোকের কীর্ত্তিরও নিদর্শনাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়ের পালরাজবংশের অধঃপতনের সময় তদ্বংশীয় কোন কোন নৃপতি জলবেষ্টিত এবং সুরক্ষিত পূর্ব্ববঙ্গের এই অংশে আগমন করিয়া কতিপয় খণ্ডরাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, এবং নগরাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি এই প্রদেশের বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধযুগের এই নিদর্শন সমূহ দেশের ইতিহাসের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ, সন্দেহ নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই সমস্ত স্থান ঢাকা নগরীর অনতিদূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও, দেশের শিক্ষিত সমাজ এই লুপ্ত গৌরব এবং ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন না। অরণ্যাভ্যন্তরস্থ স্তূপগুলি খনন করিলে এই ইতিহাসশূন্য দেশের লুপ্ত ইতিহাস

পুনরুদ্ধার হইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা গভর্ণমেণ্টের এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এই প্রদেশে ভ্রমণকালে আমরা বহু সহৃদয় ব্যক্তি'র সহায়তা এবং সহানুভূতি পাইয়াছি। তাঁহাদের অনুগ্রহ ভিন্ন এই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ সম্ভবপর হইত না। সুতরাং তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভাওয়ালের কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী তাঁহার জমীদারীস্থিত একটী প্রস্তরস্তম্ভ (পরিশিষ্ট বর্ণিত শাকসর স্তম্ভ) অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখককে দান করিয়া স্থানান্তরিত করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। কুমার বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদ্বিষয়ে বহু সাহায্য করিয়াছেন। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় নানাস্থানের সংবাদাদি প্রদান করিয়া এবং নানাবিধ মূল্যবান উপদেশাদি প্রদান করিয়া অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

গড় কাশীমপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাদের ভ্রমণকালীন সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্তাদি এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং উপকরণসংগ্রহে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন। কাশীমপুরের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্ত্তী, এবং শ্রীযুক্ত সারদা মোহন ঘোষ মহাশয়গণও এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহার্থ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

রোয়াইলের জমীদার শ্রীযুক্ত লাবণ্য মোহন রায়, বি, এল্, এবং শ্রীযুক্ত অমূল্য মোহন রায়, এম্, এ, বি, এল্, মহাশয়দ্বয় বহু প্রাচীন একখানি বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র দেব মহাশয় ভ্রমণকালীন সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে থাকিয়া নানা স্থানের আলোকচিত্র (photograph) প্রস্তুত করিয়াছেন। পুস্তক সংলগ্ন প্রায় সমস্ত চিত্রই তাঁহার প্রস্তুত।

সাভারের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্ত কবিরাজ মহাশয়, এবং শ্রীযুক্ত কালীমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ সাহা, শ্রীযুক্ত নলিনী মোহন সাহা, শ্রীযুক্ত যশোদালাল সাহা, এবং কতিপয় স্বর্ণকার তাঁহাদের সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রাসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন অধিকারী ও শ্রীমান শ্যামাচরণ সরকার নানাবিধ প্রাচীন দ্রব্যাদি সংগ্রহে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়, ঢাকা সাহিত্য পরিষদের পুরাতত্ত্ব সমিতির সভ্য স্বর্গগত শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার রায়, বি, এ, এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পীযুষকিরণ চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনার সাহায্যার্থ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

উপরোক্ত মহোদয়গণের নিকট আমি পুনরায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইঁহাদিগের নিকট আমি ঋণী।

বর্ত্তমান পুস্তক প্রণয়নে আমি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

Taylor's Topography and Statistics of Dacca; Hunter's Statistical Accounts of Dacca: Sir Alexander Cunningham's Archaeological Survey of India; and Ancient Geography of India: Stewart's History of Bengal: V. A. Smith's Early History of India; Elliott's History of India, as told by its own historians; Montgomery Martin's Eastern India; J. A. Vas's District Gazetteer of Rangpur: Dr. Rajendra Lal Mitra's Indo Aryans; Dr. Hultzsch's South Indian Inscriptions: Major Rennell's Memoirs; List of Ancient Monuments; Khan Bahadur Syed Aulad Hossein's Notes on the Antiquities of Dacca; Bradley Birt's Romance of an Eastern Capital; Bhandarkar's Report on the search of Sanskrit Manuscripts; Dr. Kern's Brihat Samhita; Francis Gladwin's Ayeen Akberi; Mc. Crindle's Ancient India as described by Ptolemy, Megasthenes, and Arrian; Samuel Beal's Buddhist Records of the Western World (Hieuent-Sang); Asiatick Researches; Journals of the Asiatic Society of Bengal; Indian Antiquary; Epigraphia Indica; Dr. Grierson's Epic of Rangpur (J. A. S. B); Sandhyakar Nandi's Ramacharitam, (Edited by Mahamahopadhya H. P. Sastri); বিশ্বকোষ; রাজতরঙ্গিণী, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাস,—

নবাবী আমল; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত ঢাকার ইতিহাস; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাস; ভাওয়ালের ইতিহাস; শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত বারভূঞা; শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত গৌড়রাজমালা; শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত গৌড়লেখমালা; শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন প্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; গৌড়ে ব্রাহ্মণ; প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস; রামাই পণ্ডিত রচিত শূন্য পুরাণ (শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত): চতুর্ভুজ রচিত হরিচরিত-কাব্য; বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলরাম; মহেশের নির্দ্দোষ-কুল পঞ্জিকা; বারেন্দ্র কুল পঞ্জী; রাঢ়ীয় ঘটক কারিকা; ভট্টগ্রন্থ: ক্ষিতীশবংশাবলী; কায়স্থকৌস্তুভ; সম্বন্ধনির্ণয়; ধ্রুবানন্দ রচিত গৌড়বংশাবলী; যশোমাধবসংবাদ; মানিকচন্দ্রের গান; দুর্ল্লভমল্লিক রচিত গোবিন্দচন্দ্র রাজার গান; ধর্ম্মমঙ্গল; শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেনের প্রবাসী পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ; শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার রায় এবং শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহার প্রতিভা পত্রি-কাতে প্রকাশিত প্রবন্ধদ্বয়: ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত হয়, এবং পরে ইহা ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ পরিচালিত 'প্রতিভা' পত্রিকাতে ১৩১৯ সনের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'প্রতিভা' 'সম্পাদক' এবং মদীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার, এম্, এ, বি, এল্, মহাশয়ের আগ্রহে ও যত্নে প্রবন্ধটী বহু পরিবর্দ্ধিত ও

সংশোধিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে প্রকাশিত হইল। ইতিহাস প্রিয় ব্যক্তিগণ সাদরে গ্রহণ করিলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। প্রবন্ধটীতে বহু ভুলভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা; সহৃদয় পাঠকগণ কোন ভ্রম পরিদর্শন করিয়া দিলে সাদরে গৃহীত হইবে। পুস্তকে মুদ্রাকর প্রমাদও দৃষ্ট হইবে। তজ্জন্য আমরা পাঠকগণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

এই পুস্তক ঢাকা সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলিভুক্ত করা হইল।

১৮, রজনী বসুর লেন।
ঢাকা।
১৩২০ বঙ্গাব্দ।

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বসু ঠাকুর।

সূচীপত্র ।

চিত্রসূচী

—o*•—

-০*০-

পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ

উপক্রমণিকা।

বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল, কাশীমপুর, চাঁদপ্রতাপ, সুলতানপ্রতাপ, এবং তালিপাবাদ, এই পাঁচটী পরগণা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের কেন্দ্রস্থল। ইহার অধিকাংশ স্থান এখনও নিবিড় অরণ্যসমাকুল, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় এই প্রদেশবাসিগণ এখনও অনেক পশ্চাৎবর্ত্তী। এইজন্য অনেকে হয়ত এই বনাবৃত প্রদেশকে একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। কিন্তু এই অরণ্যের অন্তরালে প্রায় দ্বিসহস্রাধিক বৎসরের অতীত ইতিহাসের উপকরণ লুক্কায়িত আছে, এবং তাহার আলোচনা ব্যতীত বঙ্গের ইতিহাসের একটী অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবে।

এই প্রদেশের প্রাচীনত্বের সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ ইহার অতি পুরাতন মৃত্তিকা। মৃত্তিকার স্তর ও অন্যান্য নৈসর্গিক অবস্থা দৃষ্টে ভাওয়াল অতীব প্রাচীন স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই প্রদেশের মৃত্তিকা যেরূপ গাঢ় রক্তবর্ণ, সেরূপ আর বঙ্গদেশের, অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বর্ষাকাল যখন পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থান জলে নিমজ্জিত হয়, ভাওয়াল অঞ্চল তখনও জলতল হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত থাকে। ভাওয়াল হইতে

আরও কিয়দ্দূর উত্তরে ২০ হইতে ৫০ ফিট উচ্চ বহু লোহিত মৃত্তিকার টিলা দৃষ্ট হয়। এই টিলাশ্রেণী ত্রিপুরার পর্ব্বতমালার সহিত সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। (১)

কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি ভাওয়ালের বর্ণনায় গাহিয়াছেন,—

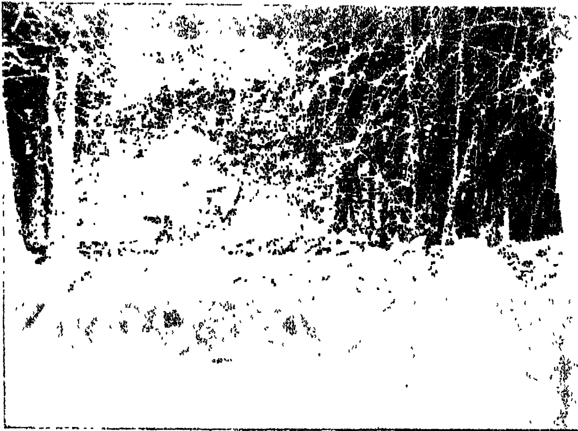
"রাঙ্গা মাটী পলাকাটী খাঁটী সোণার মত।
টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত॥"

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই মৃত্তিকার অধিকাংশই কঙ্কর, এবং তাহাতে লৌহের অংশ অত্যন্ত অধিক। (২) মৃত্তিকা কত পুরাতন হইলে এইরূপ অবস্থায় পরিণত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবুল ফজলের সময়ে সরকার বাজুহাতে লৌহের খনি ছিল, এবং ঐ প্রদেশ নিবিড় অরণ্যাবৃত ছিল। (৩) ভাওয়ালের কতকাংশ সরকার বাজুহার অন্তর্গত। এই অঞ্চলে ভ্রমণকালে আমি কাশীমপূর হইতে ৬।৭ মাইল দূরবর্ত্তী লোহাকইড় নামক একটী স্থান দর্শন করি। স্থানটা যে অতীব পুরাতন তাহা দর্শনমাত্রেই প্রতীয়মান হয়। লোহাকইড়ের কতকাংশে ২।৩ টী প্রাচীর এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র স্তূপ

(১) Taylor's Topography and Statistics of Dacca. Page 4.

(২) Ibid. Page 62.

(৩) "The forests of this Sircar (Bazoona) supply timbers fit for building boats and for the beams of houses, and here is an iron mine."—Ayeen Akberi, as translated by Francis Gladwin



লোহাকই

E. B. P. & P. House, Dacca.

বর্ত্তমান আছে। উক্ত প্রাচীর এবং স্তূপ লৌহের ন্যায় এক প্রকার পদার্থে নির্ম্মিত, এবং অদ্যাপি প্রায় ২।৩ হাত উচ্চ আছে। বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, উহা অপরিণত লৌহ (iron ore),—কঙ্কর এবং লৌহের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। হইতে পারে. আবুল ফজলের বর্ণিত লৌহখনি এই স্থানেই বিদ্যমান ছিল। শুনা যায়, লোহাকইড়ে পূর্ব্বে লৌহ নির্ম্মিত অতি বৃহদাকার কটাহের ভগ্নাংশ, এবং হাতুড়ী, বাটালি, প্রভৃতি যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে. এবং এখনও যায়। যাঁহারা স্বচক্ষে উহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি এই বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি।

এতদ্দেশীয় হিন্দু মুসলমান মাত্রেরই ধারণা যে, বহু প্রাচীন স্থান এবং দ্রব্যাদি দেবানুগৃহীত। তদনুযায়ী লোহাকইড়ে পরবর্ত্তীকালে একটী দরগা স্থাপিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বহু পুরাতন বৃক্ষরাজি সূর্য্য-কিরণ প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান। ঐ স্থানের বৃক্ষাদি কর্ত্তন করা নিষিদ্ধ। কেশা পাগলা নামক কোনও ব্যক্তি নাকি ঐ স্থানের একটী সুবৃহৎ গজারী বৃক্ষ ছেদন করাতে পুত্র পৌত্রাদি সহ অচিরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কর্ত্তিত বৃক্ষের একটী অংশ অদ্যাপি ঐ স্থলে পতিত আছে, অপর তিন অংশ জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। ঐ অংশের মধ্যস্থিত সারভাগটুকু মাত্র এখনও বর্ত্তমান; তাহা নয় হাত লম্বা, এবং উহার বেষ্টনী প্রায় তিন হাত। কিংবদন্তী এই, যে, ভাওয়াল রাজ ঐ স্থানের দৈবী শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য গজারী বৃক্ষের অবশিষ্টাংশ লইয়া

যাইবার জন্য দুইটী হস্তী প্রেরণ করেন। বৃক্ষাংশ স্পর্শ করিবার অব্যবহিত পরেই হস্তিদ্বয় প্রাণত্যাগ করে। অতিরঞ্জিত হওয়া সত্ত্বেও এই ঘটনা আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম। আলোচ্য বিষয়ের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও স্থানের প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য লোহাকইড়ের বিবরণ বিবৃত হইল।

ভাওয়ালের অন্তর্গত মির্জ্জাপুর, শাকাসর, এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামসমূহে ভ্রমণ কালে দেখিলাম যে, তদঞ্চলে মৃত্তিকায় লৌহকঙ্করের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। কোনও স্থান খনন করিলে, এবং এমন কি মৃত্তিকার উপরিভাগেও নানাবিধ যন্ত্রাদির অসংখ্য ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লৌহ গালাইয়া ঢালাই করিবার জন্য যেরূপ নানাবিধ মাটির ছাঁচ ও নল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত আছে। সুতরাং, বোধ হয় পূর্ব্বকালে এই সকল স্থানে লৌহের খনি অথবা লৌহের বিস্তৃত কারবার ছিল।

মৃত্তিকার প্রাচীনত্ব ব্যতীত ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের প্রাচীনত্বের আরও বহু প্রমাণ বিদ্যমান। হিন্দুদের পুরাণ, মহাভারত, প্রভৃতিতে এই সমস্ত স্থানের যে উল্লেখ আছে, তাহা যথাযথরূপে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, এবং তাহাতে কতক পরিমাণে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে উহার মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া তাহার আলোচনায় বিরত হইলাম।

খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে টলেমি (Ptolemy) ভারতের যে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া-

ছেন, তাহাতে ব্রহ্মপুত্রতীরে অবস্থিত অ্যান্টিবোল (Antibol) নামক একটী স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন উইল্‌ফোর্ড্ (Captain Wilford) এই অ্যান্টিবোলকে আধুনিক ফিরিঙ্গিবাজার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু, তাঁহার অনুমান সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়; কারণ, টলেমির বর্ণনার সহিত ফিরিঙ্গিবাজারের কোনই সাদৃশ্য নাই। পরন্তু, ডাক্তার জেম্‌স্ টেলার (Dr. James Taylor) এই অ্যান্টিবোল এবং ভাওয়াল একই স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৪) ভাওয়ালের উত্তরাস্থিত আঁটি (পরগণা) ভাওয়ালের সহিত সংযোগ করিলে, আঁটি-ভাওয়াল হয়। টলেমির বর্ণনানুযায়ী ভাওয়ালের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন ধারা প্রবাহিত ছিল। মহাভারত প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয় যে ভাওয়াল অঞ্চলের সংস্কৃত নাম অন্তমেল। (৫) এই অন্তমেল হইতেই বোধ হয় অ্যান্টিবোল এবং আঁটি-ভাওয়াল নামের উৎপত্তি। সুতরাং, অন্তমেল, অ্যান্টি-বোল, এবং আঁটি-ভাওয়াল একই স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। টলেমির সময়েও, অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, ভাওয়াল একজন বৈদেশিক ভ্রমণকারীর নিকটও ভারতের মধ্যে একটী উল্লেখযোগ্য স্থান বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। টলেমি অ্যান্টিবোলকে ভারতের

(৪) Taylor's Topography and Statistics of Dacca. Page 111.

(৫) Ibid. Page 111.

পূর্ব্বসীমা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তখন এই স্থানই ভৌগোলিকদিগের কুমধ্য (O. Meridian) বলিয়া গণ্য ছিল। অ্যান্টিবোল ও ভাওয়াল যদি অভিন্ন হয়, তবে উহা নিশ্চয়ই তখন ভারতের মধ্যে একটী বিখ্যাত স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল, সন্দেহ নাই।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রামকমল সেন মহাশয় তদ্রচিত অভিধানের [A Dictionary from English to Bengalee] ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, ভাওয়ালে মহাভারত বর্ণিত ভগদত্তের রাজধানী ছিল; এবং তাহার মতে "ভগালয়" হইতেই ভাওয়াল নামের উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন, কুরুক্ষেত্র সমরে ভদ্রপাল অথবা ভবপাল প্রদেশের নৃপতি কৌরব পক্ষাবলম্বন করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এই ভদ্রপাল অথবা ভবপাল হইতেই ভাওয়াল নামের উৎপত্তি।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে "ভদ্র" প্রদেশের নাম পাওয়া যায়। শ্রীযুক্তযতীন্দ্র মোহন রায় "ঢাকার ইতিহাসে" এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন।

অনেকের বিশ্বাস, মোগল রাজত্বকালে ভাওয়াল গাজী হইতেই ভাওয়াল নামের উৎপত্তি। কিন্তু এ বিষয়ে মতদ্বৈধ বর্ত্তমান। হয়ত ভাওয়াল হইতেই উক্ত গাজীর নাম ভাওয়াল গাজী হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ার সূক্ষ্ম বস্ত্র পৃথিবী বিখ্যাতছিল। কার্পাস শব্দ হইতেই বোধ হয় কাপাসিয়া নামের উৎপত্তি। কাপাসিয়ার নির্ম্মিত

বহু সূক্ষ্ম বস্ত্র দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেও বিদেশীয় বণিকগণ কর্ত্তৃক এমন কি রোম (Rome) প্রভৃতি স্থানেও নীত হইত। রোমান পণ্ডিত প্লিনী (Pliny) খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাপাসিয়া জাত সূক্ষ্ম বস্ত্রের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী রোমেও উহা ধনীর বিলাস সামগ্রী বলিয়া আদৃত হইত। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে, দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভাওয়ালের শিল্পকার্য্য সুবিখ্যাত ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন্থ্‌সাঙ্‌ ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি কামরূপ এবং সমতট রাজ্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় ভাওয়াল এই উভয় রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবস্থিত ছিল। বরাহ মিহির আধুনিক পূর্ব্ববঙ্গকে সমতট আখ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন। (৬) প্রয়াগ স্তম্ভে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের যে প্রস্তর লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গকে সমতট আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। (৭) কানিংহাম সাহেব (Sir Alexander Cunningham) নানারূপ প্রমাণ সহ দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গকেই (Delta of the Ganges) হিউয়েন্থ্‌-সাঙ্‌ সমতট এবং টলেমী গাঙ্গে রিজিয়া (Gange Regia) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (৮) হিউয়েন্থ্‌-সাঙ্‌ এই প্রদেশ-জাত পনস (কাঁঠাল) ফলের যে বর্ণনা

(৬) Dr. Kern's "Brihat Samhita." XIV. 6.

(৭) J. A. S. B. VI. Line 19 of inscription.

(৮) Cunning ham's "Ancient Geography of India." Page. 502, 3.

দিয়াছেন, (১) তাহা অতীব কৌতুহলোদ্দীপক ; এবং উহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হিউয়েন্থ্-সাঙ্ ভাওয়াল-জাত পনসেরই বর্ণনা করিয়াছেন। ভাওয়ালে যেরূপ প্রভূত পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট পনস জন্মে, অন্য কুত্রাপি তদ্রূপ জন্মে কি না জানি না। ভাওয়াল বোধ হয় এখনও এই জন্য বিখ্যাত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বহু বিদেশীয় লেখক এবং পরিব্রাজক তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদ্বারা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ হইতে ভাওয়াল সভ্য জগতে বিদিত।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে নৃপতিগণের বিবরণ পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, তাঁহারা দ্বিসহস্র না হইলেও, প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন।

---

(১) The panasa (pan—na—so) fruit, though plentiful, is highly esteemed. The fruit is as large as a pumpkin. When it is ripe, it is of a yellowish-red colour. When divided, it has in the middle many tens of little fruits of the size of a pigeon's egg ; breaking these, there comes forth a juice of a yellowish red colour and of delicious flavour. The fruit sometimes collects on the tree branches, but sometimes at the tree roots as in the case of the earth growing fu-ling (the china-root). Samuel Beal's "Buddhist Records of the Western world." Vol II. P. 194.

ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ায় শিশুপাল, তালিপাবাদ পরগণার অন্তর্গত মাধবপুরে (গাজী বাড়ীতে) যশোপাল, এবং কাশীমপুর পরগণার অন্তর্গত সাভার কোটবাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র পাল রাজত্ব করিতেন। পরে যথাক্রমে ইঁহাদের প্রত্যেকের বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। এই নৃপতিগণ সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অনেকের ধারণা, ইঁহারা অপেক্ষাকৃত নিম্নবংশ সম্ভূত এবং গৌড়ের পালরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ ; কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক, তাহা আমরা পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকও পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ অবলম্বনে ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ বর্ণনা স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাহারও মতে পূর্ব্বোক্ত নৃপতিগণ ভুঁইঞা (১০), আবার কাহারও মতে বানিয়া (১১) ছিলেন। সাভারে মাহিষ্য জাতীয় কতিপয় ব্যক্তি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে নিজেদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া প্রচার করেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কোণ্ডা নিবাসী শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায়কে হরিশ্চন্দ্রের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১২)। ইঁহারা হরিশ্চন্দ্রকে আদিপুরুষ করিয়া এক বংশাবলীও উপস্থিত করেন। বংশাবলী অনুসারে ভারতচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের অধস্তন অষ্টত্রিংশ পুরুষ। ইঁহাদের উক্তি অনুসারেও বংশাবলীখানা একশত বৎস-

(১০) Hunter's Statistical account of Bengal.—Dacca.

(১১) Taylor's Topography and Statistics of Dacca. Pages 63, 64.

(১২) প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৯।

রের অধিক কালের লিখিত নহে। অন্য কোনরূপ বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এই বংশাবলী ঐতিহাসিক হিসাবে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

হরিশ্চন্দ্র পালবংশীয় নৃপতি, তাহা তাঁহার সদ্যঃ প্রাপ্ত ইষ্টকলিপি হইতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইবে। সুতরাং তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি জীবিত থাকিলে পালের পরিবর্ত্তে রায় উপাধি ধারণ করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, হরিশ্চন্দ্র গৌড়ের পাল নৃপতিগণের বংশধর, তাহা পরে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। গৌড়ের পাল নৃপতিগণ নিশ্চয়ই মাহিষ্য ছিলেন না, তাহা ইতিহাস পাঠকগণ অবগত আছেন। তৃতীয়তঃ, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার সময় হরিশ্চন্দ্রের বংশধরগণ সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ অনুমান করাও বোধ হয় যুক্তি সঙ্গত নহে, এবং তাহা নিশ্চয়ই প্রমাণসাপেক্ষ। সমাজ বিনাদোষে রাজবংশীয়গণের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতে সাহসী হইবে, ইহাও বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

পালরাজগণ [কমৌলিতে প্রাপ্ত] বৈদ্যদেব প্রশস্তিতে সূর্য্যবংশ সম্ভূত ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"এতস্য (হরেঃ) দক্ষিণদৃশো বংশে মিহিরস্য
জাতবান্ পূর্ব্বং।
বিগ্রহপালো নৃপতিঃ সর্ব্বাকারর্দ্ধি-সংসিদ্ধঃ॥"

সন্ধ্যাকর নন্দি-বিরচিত "রামচরিত" কাব্যে তাঁহারা "সিন্ধুকুলোদ্ভূত" এবং "শ্রীপতেঃ নাভিসম্ভূতঃ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সিংহগিরি রচিত "বল্লালচরিতের"

অন্তর্গত "ব্যাসপুরাণে" পালরাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহাদিগকে অধম ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু সেনরাজগণের আশ্রিত গ্রন্থকার তাঁহার প্রভু বংশের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশকে বিদ্বেষ বশতঃ অধম ক্ষত্রিয় বলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। আবুল ফজল পালবংশীয় নৃপতিগণকে "কায়েথ" (কায়স্থ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১৩) কায়েথ, অথবা কায়স্থগণ মসী জীবি ক্ষত্রিয়' মসীজীবি হইতে অসিজীবি ক্ষত্রিয়গণ স্বভাবতঃই অধিক সম্মানের পাত্র। সেই জন্যও হয়ত সিংহগিরি (মসীজীবি ক্ষত্রিয়) কায়স্থ বংশীয় পালনৃপতিগণকে অধম ক্ষত্রিয় বলিতে পারেন।

এতদ্ভিন্ন পালনৃপতিগণ সর্ব্বদাই ক্ষত্রিয় রাজকন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিতেন। ক্ষত্রিয় না হইলে ক্ষত্রবংশে বিবাহ হওয়া সম্ভব পর নহে। ["রামচরিত" কাব্যের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রশ্নের মীমাংসা যেরূপ ভাবে করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা সন্তোষ জনক বলিয়া বোধ হয় না, এবং আমরা তাঁহার মতের সমর্থন করিতে পারি না।]

পালবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট পতি পরবলের কন্যা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

"শ্রীপরবলস্য দুহিতুঃ ক্ষিতিপতিনা রাষ্ট্রকূটতিলকস্য।
রণ্ণাদেব্যাঃ পাণির্জগৃহে গৃহমেধিনা তেন (ধর্ম্মপালেন) ॥"

—দেবপালদেবের (মুঙ্গেরে প্রাপ্ত) তাম্রশাসন।

(১৩) Francis Gladwin's Translation of Ayeen Akberi. Page 311.

বিগ্রহপাল হৈহয়বংশ সম্ভূতা লজ্জাদেবীকে বিবাহ করেন।

"লজ্জেতি তস্য জলধেরিব জহ্নুকন্যা
পত্নীবভূব কৃত-হৈহয়-বংশভূষা।"

—নারায়ণপালদেবের (ভাগলপুরে প্রাপ্ত) তাম্রশাসন।

রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটপতি তুঙ্গদেবের দুহিতা ভাগ্যদেবীর সহিত পরিণীত হন।

"রাষ্ট্রকূটান্বয়েন্দোস্তঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলে দুহিতরি তনয়ো
ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ।"

—প্রথম মহীপালদেবের (বাণগড়েপ্রাপ্ত) তাম্রশাসন।

তৃতীয় বিগ্রহপাল দাহলাধিপতি কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রী, চেদীর রাজকন্যা, এবং রাষ্ট্রকূট রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ইতিহাস আলোচনা করিলে পালরাজগণের ক্ষত্রিয়ত্বের বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজগণের তাম্রশাসন প্রভৃতিতে তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ না থাকাতে অনেকে সন্দেহ করেন, যে হয়ত তাঁহারা নিম্নজাতীয় ছিলেন। কিন্তু, এইরূপ অযথা সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহারা জাতিভেদের পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং সেই জন্যই তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সন্ধ্যাকর নন্দী এবং বৈদ্যদেব রামপাল এবং তৎপুত্র কুমারপালের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং, পালরাজগণের জাতি সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তি অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা কায়স্থজাতীয় ছিলেন। তৎকালে কায়স্থগণ ব্যবহারিক জীবনেও ক্ষত্রভাবাপন্ন থাকাতে

সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় শব্দদ্বয় তখন প্রায় একার্থ-বোধকই ছিল ; শাস্ত্রাদিতে কায়স্থদের পৃথক উল্লেখ থাকিলেও তৎকালে ঐ অর্থগত প্রভেদ লক্ষিত হইত না। কায়স্থগণ প্রকৃত-পক্ষে মসীজীবি হওয়ার পর হইতেই বোধ হয় অসিজীবি ক্ষত্রিয় এবং মসীজীবি কায়স্থের প্রভেদ পরিস্ফুটতর হইয়াছে। পালরাজগণ কায়স্থ ছিলেন, এই বিশ্বাস আকবরের সময়েও প্রচলিত ছিল, তাহা আবুলফজলের গ্রন্থ হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। আবুল ফজল নিশ্চয়ই তৎসময়ে প্রচলিত প্রবাদ অথবা কোন গ্রন্থ হইতে এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার মূলে যে কোন সত্য নাই, তাহা বিশ্বাস করিতে আমরা অক্ষম। ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া গৃহীত না হইলেও ইহাতে অবিশ্বাসযোগ্য কিছু নাই।

পালরাজগ সম্বন্ধীয় যাহা কিছু এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীতেই তাঁহারা যে বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বী ছিলেন, তদ্বিষয়ক সুস্পষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনা বাহুল্য মাত্র। সাভারে হরিশ্চন্দ্রপালের প্রাসাদ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষের মধ্যে বহু প্রস্তর নির্ম্মিত, ও ইষ্টক খোদিত বুদ্ধ ও বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। [এতদ্বিষয়ে পরে আলোচিত হইয়াছে।] সাভারের হরিশ্চন্দ্রপাল ও তদ্বংশধরগণ যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, ইহাই বোধ হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যশোপাল স্বীয় রাজধানীতে হিন্দু-

দেবতা মাধবের প্রতিষ্ঠা করিলেন, ইহা প্রথম দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু, বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী গৌড়ের পালরাজগণও বিশেষ বিশেষ হিন্দুপার্ব্বণোপলক্ষে এবং হিন্দু দেবদেবীর সংরক্ষণার্থ ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিতেন, তাহা তাঁহাদিগের বহু তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা হিন্দুর দেবদেবী এবং ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপাল দেবের তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে,—

"শাস্ত্রার্থভাজা চলতোহনুশাস্য
বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে।
শ্রীধর্ম্মপালেন সুতেন সোহভূৎ
স্বর্গস্থিতানা মনৃণঃ পিতৃণাম্॥"

এই শ্লোকে ধর্ম্মপাল শাস্ত্রশাসন হইতে বিচলিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহকে স্ব স্ব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা-পয়িতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে ভূমিদান কালে সর্ব্বজাতীয় প্রজাগণকে যথাযোগ্য সম্মান করিবার, বিশেষতঃ বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বাগ্রে সম্মান প্রদর্শণ করিবার কথা লিখিত আছে।

"* * * ব্রাহ্মণ-মাননা পূর্ব্বকং যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।"

এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধ হইলেও পালনৃপতিগণ দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। সুতরাং, এমতাবস্থায় যশোপাল কর্ত্তৃক মাধব প্রতিষ্ঠা

অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হইতেছিল। সুতরাং তৎসময়ে বৌদ্ধনৃপতিগণেরও কিঞ্চিৎ হিন্দুভাবাপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যুগে হিন্দুর ন্যায় বৌদ্ধগণও মূর্ত্তিপূজায় বিশ্বাসবান হইয়াছিলেন ; এবং মৃত্তিকা নিম্ন হইতে উত্থিত প্রত্যক্ষ ক্ষমতাপন্ন মাধবকে প্রতিষ্ঠিত করা যশোপালের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

শিশুপাল।

ভাওয়াল পরগণার বহু স্থানে ইষ্টকস্তূপ, মৃৎপ্রাচার, বৃহদায়তন দীর্ঘিকা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। ইহার অধিকাংশই শিশুপাল রাজার কীর্ত্তিচিহ্ন, দেশ প্রচলিত প্রবাদ এইরূপ। ভাওয়াল অঞ্চলস্থিত দুরদুরিয়া, কোট, দীঘলিয়ার ছিট, শৈলাট, শাইটহালিয়া, প্রভৃতি গ্রামসমূহেই শিশুপালের কীর্ত্তিচিহ্ন বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

বঙ্গের স্বাধীন মুসলমান নৃপতিগণের ইতিহাসে একডালা দুর্গের বহুস্থানে উল্লেখ দৃষ্ট হয়; কিন্তু একডালা গ্রামে বর্ণিত দুর্গের কিংবা কোনরূপ প্রাচীন কীর্ত্তির কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। পরন্তু, একডালার ৮ মাইল উত্তরে কাপাসিয়ার নিকটবর্ত্তী দুরদুরিয়া গ্রামে উক্ত দুর্গের বহুচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। সুতরাং মনে হয়, ঐ স্থানেই সুপ্রসিদ্ধ একডালাব দুর্গ অবস্থিত ছিল।

দুরদুরিয়া গ্রাম বানার নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। ঠিক নদীতটেই একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, এবং তাহার বিপরীতদিকে একটী নগরের বহুচিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান। এই নগর এবং দুর্গ উভয়ই শিশুপাল রাজার নির্ম্মিত, এইরূপ প্রবাদ। কেহ কেহ বলেন (প্রথম) বল্লালসেন এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গ নিম্নে বানার নদী পাঁচশত হস্তেরও অধিক বিস্তৃত, ও অতিশয় গভীর, এবং পার্ব্বত্য নদীর ন্যায় খরস্রোতা। নদী গর্ভ হইতে তটদেশ প্রাচারের ন্যায় উত্থিত হইয়াছে, এবং শীতকালে তটের প্রায় ৫০ ফিট নিম্নে জল থাকে। সুতরাং,

তটদেশের উচ্চতা সহজেই অনুমেয়। বানার নদী দুর্গটীকে প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়াছে। তটদেশে কঙ্করময় কঠিন লোহিত মৃত্তিকা। নদীতীরে এবং দুর্গের চতুর্দ্দিক সুপ্রশস্ত মৃৎ প্রকার বেষ্টিত। প্রাকার এখনও প্রায় ১২।১৪ ফিট উচ্চ রহিয়াছে। পশ্চিম দিকে দুর্গ নিম্নেই বানার নদী, এবং অপর তিন দিকে ঠিক দুর্গ প্রাকারের অব্যবহিত নিম্ন দিয়া প্রায় ৩০ ফিট প্রশস্ত পরিখা। পরিখার অনেক স্থান এখন ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট রূপে বিদ্যমান। দুর্গ-প্রাচীরের দৈর্ঘ্য দুই মাইলেরও অধিক। সুতরাং, অতি বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে এই দুর্গ অবস্থিত ছিল। দুর্গপ্রাকারে পাঁচটী প্রবেশ-দ্বার দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোনটীতেই ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত থাকার কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। দুর্গটীর অবস্থান এবং এইরূপ সুরক্ষিত স্থান-নির্ব্বাচন নির্ম্মাতার রণ কৌশলের পরিচায়ক।

দুর্গ-প্রাকার-বেষ্টিত স্থানের মধ্যে পুনরায় অন্য একটী স্থান প্রাচীর বেষ্টিত অবস্থায় অবস্থিত। এই প্রাচীরেরও বহু চিহ্ন বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে আবার একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। এই স্থানে ইষ্টক-প্রাচীরের পরিবর্ত্তে এখন একটী লম্বা মৃৎস্তূপ এবং তদুপরি বহু ইষ্টক পতিত আছে। কোনও কোনও স্থানে ইষ্টক-প্রাচীরের ভিত্তিও দৃষ্ট হয়; প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার আর একটী পরিখা দৃষ্ট হয়, এবং বোধ হয় যেন উক্ত ইষ্টক প্রাচীর উহারই এক অংশ বিভক্ত

করিয়া লইয়াছে। এই পরিখা নদীর সহিত সংযুক্ত, এবং আনুমানিক প্রায় ৬০০ গজ লম্বা।

দুর্গের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাচীর এবং পরিখাবেষ্টিত স্থানটী বোধ হয় সুরক্ষিত রাজপুরী। এই পুরীর তিনটী প্রবেশ-দ্বার দৃষ্ট হয়, এবং পুরীমধ্যে দুইটী অট্টালিকার চিহ্ন সুস্পষ্ট বিদ্যমান। দুইটী উচ্চ স্তূপ প্রায় নদীতীরে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকস্থ স্তূপোপরি প্রায় বৃত্তাকার একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত ভিত্তি দৃষ্ট হয়। উহা বোধ হয় পূর্ব্বে শত্রুর আগমন পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য অত্যুচ্চ 'বুরুজ' (tower) ছিল। বুরুজের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক প্রাচীরের চিহ্ন বর্ত্তমান এবং প্রাচীরের চারি কোণে বোধ হয় চারিটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র 'বুরুজ' (Bastions) ছিল। উহারও স্পষ্ট চিহ্ন আছে।

উত্তর দিকস্থ স্তূপের ভিত্তিচিহ্ন-সমূহ স্পষ্ট নহে। দুইটী চতুষ্কোণ সমুন্নত স্থান উহাতে দৃষ্ট হয়: উহার অদূরে একটী দীর্ঘিকা বর্ত্তমান। দীর্ঘিকা দুর্গ পরিখার সহিত একটী অপ্রশস্ত খাল দ্বারা সংযুক্ত।

দুর্গমধ্যস্থ বিভিন্ন প্রাচারের মধ্যস্থিত ভূভাগ-সমূহে বহু ইষ্টক এবং মৃত্তিকা-স্তূপ বর্ত্তমান, এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘিকার চিহ্নও দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত জলাশয় কালক্রমে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুর্গমধ্যে স্তূপীকৃত এবং বিক্ষিপ্ত বহু ইষ্টক পড়িয়া আছে। নদীতীরে বহু মৃত্তিকা এবং ইষ্টক-স্তূপ দৃষ্ট হয়, এবং উহা রাজপুরীর নানা অংশ বলিয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হয়। দুর্গ এবং রাজপুরীর অনেক অংশ নদীর স্রোতে ভাঙ্গিয়া

গিয়াছে। প্রাচীনগণের উক্তি অনুসারে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে নদী অত্যন্ত অপ্রশস্ত ছিল।

এই দুর্গ স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক রাণীবাড়ী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রবাদ এই, শিশুপালবংশীয়া রাণী ভবানী ঐ দুর্গে বাস করিতেন ; এবং মুসলমানগণ বোধ হয় (১২০৪ খৃষ্টাব্দে) ইঁহাকে পরাজিত করিয়াই শিশুপাল-রাজ্য জয় করেন। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বোধ হয় এই দুর্গেই বঙ্গের দ্বিতীয় স্বাধীন মুসলমান নৃপতি ইলিয়াস সামসুদ্দিন্ সম্রাট ফিরোজসাহ দ্বারা অবরুদ্ধ হন। অবরোধ-কালে ইলিয়াস সাহ ফকিরের ছদ্মবেশে দুর্গ ত্যাগ করিয়া রাজা ভবানী (বিয়াবনী) নামক জনৈক দেশ-বিখ্যাত সাধুর মৃতদেহের সৎকার কার্য্যের সময় উপস্থিত থাকিয়া পরে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ছদ্মবেশে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই। (১৪) এই রাজা ভবানী বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত রাণী ভবানীর কোন বংশধর।

দুর্গ জয়ে অসমর্থ সম্রাট ফিরোজ সাহ ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইলিয়াস সাহের পুত্র সেকেন্দর সাহের রাজত্ব-কালে সম্রাট কর্ত্তৃক পুনরায় এই দুর্গ আক্রান্ত হয়। এবারেও দুর্গজয়ে অসমর্থ সম্রাট অবশেষে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হোসেন সাহ বঙ্গদেশে অবস্থানকালে এই দুর্গেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ফকির কুতুব আলম্‌আলমের সিদ্ধ স্থান পাণ্ডুয়াতে

(১৪) Stewart's "History of Bengal".

প্রতিবৎসর একবার পদব্রজে তীর্থ দর্শন করিতে আসিতেন।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, শিশুপাল-নির্ম্মিত এই দুর্গ মুসলমান রাজত্বের সময়েও একডালা দুর্গ নামে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বানার নদীর পূর্ব্ব তীরে এই দুর্গ অবস্থিত। পশ্চিম তীরে ঠিক দুর্গের বিপরীত দিকে শিশুপাল প্রতিষ্ঠিত নগরের চিহ্নসমূহ বর্ত্তমান। অতি বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্যাপিয়া এই নগর অবস্থিত ছিল। নদীতীরে এবং প্রাচীন নগরের সর্ব্বত্রই বহু ইষ্টক চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। নদীতীর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে দুইটী প্রকাণ্ড এবং অতি গভীর দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে। উহারা উভয়েই শিশুপাল কর্ত্তৃক খনিত, এইরূপ জন প্রবাদ।

নদীতীরে শিশুপালের কাচারী বাড়া অবস্থিত; এখন শুধু সেখানে একটা ইষ্টকবহুল মৃৎস্তূপ উহার অতীত জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কাচারী বাড়ীর অদূরে দুর্গবাড়ীর ভগ্নাবশেষ, এবং একটী মস্‌জিদ্ দৃষ্ট হয়। মস্‌জিদ্‌টী প্রায় প্রস্তর-নির্ম্মিত; এবং 'সেখ আলার মস্‌জিদ্' নামে খ্যাত। খুব সম্ভবতঃ সুলতান আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী কালে উক্ত মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দুরদুরিয়ার (একডালা দুর্গের) পর টোকের নাম উল্লেখ যোগ্য। টোকেও শিশুপালের বহু কীর্ত্তি-চিহ্ন বর্ত্তমান। টোক কাপাসিয়ার অন্তর্গত, এবং বানার ও

ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম-স্থলের অদূরে বানার নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। টোক শিশুপালের রাজধানী (আধুনিক দীঘলির ছিট) হইতে কয়েক মাইল মাত্র দূরে। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, শিশুপালের প্রকৃত রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দীঘলিরছিট গ্রামে বিদ্যমান। দুরদুরিয়া কিংবা টোকে শিশুপালের রাজধানী ছিলনা; এতদুভয় স্থানেই শিশুপালের দুর্গ এবং প্রতিষ্ঠিত নগর অবস্থিত ছিল।

টলেমি বর্ণিত টুগ্‌মা (Tugma) দ্বাদশ শতাব্দীতে আরব দেশীয় ভৌগোলিক অল এদ্রিসি (El-Edrissi) বর্ণিত টোক (Tauke), এবং নবম শতাব্দীর মুসলমান পরিব্রাজকগণ বর্ণিত টফেক (Tafek), এবং শিশুপালের দুর্গ টোক একই স্থান বলিয়া টেলর (Taylor) অনুমান করিয়াছেন। (১৫) ক্যাপ্‌টেন্‌ উইলফোর্ড এবং ডি অ্যান্‌ভিল্‌ (D'Anville) টুগ্‌মা প্রভৃতি স্থানকে অন্য স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এবিষয়ে টেলরের অনুমানই আমাদের নিকট যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং টোকের ঐতিহাসিকতাও বহু প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। টোকের অবস্থান অতি সুন্দর—ঠিক দুর্গের উপযোগী। এই স্থানে শিশুপালের দুর্গের বহু চিহ্নাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান, কিন্তু অতি নিবিড় বনাকীর্ণ এবং শ্বাপদ-সঙ্কুল স্থান

(১৫) Taylor's "Topography and Statistics of Dacca." Page 116.

হওয়াতে সমস্ত প্রাচীন স্থানগুলি দর্শন করা সম্ভবপর নহে।

শ্রীপুর রেলষ্টেশন হইতে ১০।১৫ মাইল দূরে দীঘলির ছিট নামক গ্রাম অবস্থিত; এই গ্রামেই শিশুপালের রাজধানী ছিল এইরূপ জন-প্রবাদ। গ্রামটী ভাওয়ালের উত্তর পশ্চিমাংশ-স্থিত, এবং নিবিড় অরণ্যাবৃত। উহা এখন কালবশে শ্বাপদকুলের আবাসভূমি হইলেও, উহার স্থানে স্থানে প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, প্রাচীরাদির জীর্ণ তনু, এবং শুষ্ক দীর্ঘিকা নিচয় পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরিত করিয়া প্রবাদ-বাক্যের পোষকতা করিতেছে। দীঘলির ছিটে কয়েকটী ইষ্টক-বহুল মৃৎস্তূপ বর্ত্তমান, এবং উহার সান্নিধ্যে একটি সুবৃহৎ গভীর দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। ঐ স্তূপগুলি রাজধানীর অট্টালিকা সমূহের ভগ্নাবশেষ; এবং উক্ত দীর্ঘিকাটি শিশুপালের খনিত। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বিশ্বাস, যে, ঐ স্থানে প্রভূত ধনসম্পত্তি স্তূপনিম্নে নিহিত আছে; কিন্তু যক্ষের ধন বলিয়া কেহ তাহার অনুসন্ধান করিতে সাহসী হয় না। শিশুপালের বাড়ী দুষ্প্রবেশ্য নিবিড় বনাকীর্ণ; কয়েকটী বনাবৃত বৃহৎ স্তূপ দূর হইতে দৃষ্ট হয়। দীঘলির ছিট আধুনিক নাম; রাজধানীর প্রাচীন নাম জানা যায় না।

দীঘলির ছিটের অনতিদূরে শৈলাট গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানেও শিশুপালের প্রাসাদের বহু ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকেই সুগভীর পরিখা বর্ত্তমান। রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ একটী স্থান পুষ্পবাটিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ইষ্টক নির্ম্মিত রাজপথের চিহ্নাদিও স্থানে

স্থানে দৃষ্ট হয়। শৈলাটগ্রামের চতুর্দ্দিকে আরও বহু ভগ্ন স্তূপাদি বর্ত্তমান ; ঐ সকলও শিশুপাল রাজারই কীর্ত্তি-চিহ্ন।

শৈলাট গ্রামের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত শাইট-হালিয়া গ্রামেও একটী প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। তাহার চতুর্দ্দিক সুপ্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত ; এবং এখানেও ইষ্টকনির্ম্মিত রাজপথের সুস্পষ্ট চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। ভগ্নস্তূপের সন্নিকটে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা বর্ত্তমান ; উহার চারিপার ইষ্টকনির্ম্মিত। "দাস রাজার বাড়ী" বলিয়া এইস্থান বিখ্যাত। কিন্তু, ইহাও বোধ হয় শিশুপালেরই একটী প্রাসাদ ছিল।

ভাওয়াল অঞ্চলে ভ্রমণকালে শুনিলাম কাপাসিয়ার সন্নিকটস্থ বড়চালা নামক গ্রামে কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে অরণ্যমধ্যে একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে খনন করাতে মৃত্তিকা নিম্নে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ, একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি ও দশাবতার-মূর্ত্তি-অঙ্কিত প্রস্তর ফলক এবং অন্যান্য বহু দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছিল। মির্জ্জাপুর নামক গ্রামেও নাকি ঐরূপ একটী মন্দিরাভ্যন্তরে কয়েকটী যজ্ঞকুণ্ড দৃষ্ট হইয়াছিল। এই সমস্ত মন্দির প্রভৃতি পালরাজগণের সময়ের, এইরূপই অনুমিত হয়।

গৌড়ের পালরাজগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কাম্বোজ (নেপাল) বাসী কোনও ব্যক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিগ্রহপালের রাজ্যের একাংশের উপর স্বীয় আধিপত্য

বিস্তার করেন, এবং আধুনিক দিনাজপুরে এক জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি" নিজের এই উপাধি উৎকীর্ণ করেন। সেই স্তম্ভলিপি এখনও বর্ত্তমান। (১৬) পুনরায় দুষ্কার্য্যরত দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্য বা দিব্বোক যুদ্ধে মহীপালকে নিহত করিয়া বরেন্দ্রভূমি অধিকার করেন, এবং দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রের রাজপদে অভিষিক্ত হন; পরে বহুচেষ্টায় মহীপালের কনিষ্ঠভ্রাতা রামপাল যুদ্ধে ভীমকে পরাজিত করিয়া বিজিত রাজ্য পুনরধিকার করেন। (১৭) "ভীম রামপালদেবের আক্রমণ বেগ প্রতিহত করিবার আশায়, বরেন্দ্রমণ্ডলের প্রান্তভাগের নানাস্থানে যে সকল মৃৎ-প্রাকার রচনা করাইয়া ছিলেন, তাহা এখনও "ভীমের ডাইঙ্গ" এবং "ভীমের জাঙ্গাল" নামে কথিত হইতেছে।" (১৮)।

গৌড়ের পালরাজগণের রাজত্বকালে যে রূপ নানা নিম্নজাতীয় ব্যক্তির বিদ্রোহের বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই, শিশুপালের অথবা তৎবংশধরগণের রাজত্ব কালেও আমরা তদ্রূপ চণ্ডাল বিদ্রোহের জনপ্রবাদ শুনিতে পাই। শিশুপাল অথবা তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কাহারও রাজত্ব সময়ে প্রতাপ ও প্রসন্ন নামে চণ্ডাল

(১৬) "গৌড়রাজমালা।"— ৩৭ পৃঃ।

(১৭) সন্ধ্যাকর নন্দিরচিত "রামচরিতম্।" (Edited by Mahamahopadhaya H. P. Sastri).

(১৮) "গৌড়রাজমালার" উপক্রমণিকা। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। — ৷৹ পৃষ্ঠা।

জাতীয় দুইভ্রাতা একটী স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন। রাজেন্দ্রপুর রেলষ্টেশন হইতে অনতিদূরে, এবং আধুনিক জয়দেবপুরের দশক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে রাজাবাড়ী নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। এখনও রাজাবাড়ীতে রাজবাটীর চিহ্নস্বরূপ প্রাচীরাদির ভগ্নাবশেষ ও পরিখাদি দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানটী এখনও "চাঁড়াল রাজার বাড়ী" নামে খ্যাত। এই চণ্ডাল ভ্রাতৃ-দ্বয় গৃহবিবাদে রাজ্যচ্যুত হন। প্রতাপ ও প্রসন্ন বোধহয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশের পর তদ্ধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিকে বিদ্বেষ বশতঃ চণ্ডাল বলিয়া অভিহিত করা স্বাভাবিক। রাজাবাড়ীতে প্রাপ্ত একখানা লিপি লণ্ডন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। তাহাতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী কোন নৃপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং, ইহা হইতে অনুমিত হয় যে প্রতাপ ও প্রসন্ন বোধ হয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

প্রবাদ এই, তাঁহারা নীচজাতীয় বলিয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ব্যাক্তিগণ তাঁহাদের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতেন না। ক্ষমতা গর্ব্বিত চণ্ডাল ভ্রাতৃদ্বয় বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ গণকে স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করাইতে দৃঢ়সংকল্প করিয়া রাজ্যের সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করেন। ব্রাহ্মণগণ ভোজনে উপবিষ্ট হইলে প্রতাপ ও প্রসন্ন উভয় ভ্রাতার স্ত্রীই পরিবেশনার্থ অন্নপাত্র হস্তে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি জনৈক ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, 'আমরা রাজার অন্ন গ্রহণ করিব।' উভয় ভ্রাতার মধ্যে প্রকৃত রাজা কে তাহা নির্ণীত হইল না; এবং এই সূত্রেই গৃহ-

বিবাদ আরম্ভ হইয়া প্রতাপ ও প্রসন্ন উভয়েই রাজ্য-চ্যুত হইলেন। ব্রাহ্মণগণেরও জাতি নষ্ট হইল না। যুদ্ধে উভয় ভ্রাতাই প্রাণ হারাইয়া ছিলেন. এইরূপ প্রবাদ। প্রতাপ ও প্রসন্নের যোগ্‌গী নাম্নী এক ভগ্নী ছিলেন। তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ এখন "যোগ্‌গীর মঠ" নামে খ্যাত হইয়া "চাঁড়াল রাজার বাড়ী"র অদূরেই বর্ত্তমান।

খাইডা ডোস্কা নামক এক রাজার নামও ভাওয়াল অঞ্চলে শ্রুত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভাটের গানও এদেশে প্রচলিত আছে. এবং তাহাতে তিনি কায়েথ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"খাইডা ডোস্কা ছিল রাজা—

খাইডা ডোস্কা ছিল রাজা মহাতেজা কায়েতের কুলে,
কত দালান কোঠা তৈয়ার কল্ল ভাওয়াল জঙ্গলে.
সে যে আপন মনে।
সে যে আপন মনে প্রতাপেতে রাজ্য শাসন করে,
কত সুখশান্তি বিরাজ করে প্রজার ঘরে ঘরে,
নানা স্থানে স্থানে।
নানা স্থানে স্থানে শুভ ক্ষণে পুষ্কণি কাটিল.
বেলাই বিল শুষ্ক করি নিজ প্রতাপ দেখাইল.
ভাই অদ্ভুত কাহিনী।" (১৯)

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন. যে, "জন-শ্রুতি ও নাম পর্য্যালোচনায় ইনি তিব্বতদেশীয় ছিলেন, এইরূপ বোধ হয়। খাইডা ডোস্কা

(১৯) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত "ঢাকার ইতিহাসে" এই গানটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

কায়স্থ জাতির সহিত মিলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, ভাট পরিচয়ে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।” শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় খাইডা ডোস্কা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। সেন মহাশয় অবগত আছেন কিনা জানিনা, যে, পূর্ব্ববঙ্গে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডকে খাইডা, এবং স্থূলকায়কে ডোস্কা অথবা ঢোস্কা বলা হইয়া থাকে। হয়ত নৃপতি অত্যন্ত স্থূলদেহ হওয়াতে লোকে বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে খাইডা ডোস্কা বলিত, এবং ক্রমে সেই নামই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত নৃপতি তিব্বতদেশীয়, অথবা বিদেশাগত এরূপ কোন প্রবাদ নাই। সুতরাং, বিনাকারণে পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত করা আমরা সমীচীন বোধ করি না। বিশেষতঃ, তিব্বতীয় ভাষায় খাইডা ডোস্কা শব্দের কোনরূপ অর্থ হয় কিনা. জানিনা। এমতাবস্থায় এই অদ্ভূত নাম শ্রবণ মাত্রই তাহা তিব্বত দেশীয় বলিয়া অনুমান করা উচিত নহে।

কাহারও কাহারও মতে খাইডা ডোস্কার অপর নাম খট্টেশ্বর ঘোষ; তিনি কায়স্থ জাতীয়, এবং তাঁহার সন্তানগণ অদ্যাপি ভাওয়ালের অন্তর্গত বাইরা গ্রামে বাস করিতেছেন। খট্টেশ্বর ঘোষ ভাওয়ালের তদানীন্তন একজন প্রতাপশালী ভূস্বামী ছিলেন। কথিত আছে, যে, ভাওয়ালের অন্তর্গত সুবৃহৎ বেলাই বিল পূর্ব্বে একটী খরস্রোতা স্রোতস্বতীরূপে বিরাজমান ছিল। এই স্রোতস্বতীতে খাইডা ডোস্কার পুত্র এবং পুত্রবধূ নৌকাডুবি হইয়া মারা যাওয়াতে প্রতাপশালী নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া উহা হইতে ৮০টী খাল কর্ত্তন করিয়া উহার সমস্ত জল

নিঃশেষিত করেন, এবং উহা তদবধি এই বিলে পরিণত হয়। "ঢাকার ইতিহাসে" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন রায় লিখিয়াছেন, "গত বৎসর বেলাই বিলের একটী মৎস্যের ডাঙ্গা খনন করিতে মৃত্তিকার নীচে সারি সারি কাঁঠাল গাছের গোড়া পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং, বিল হইবার পূর্ব্বে ঐ স্থানটী একটী জনপদ ছিল এরূপঅনুমান করা অসঙ্গত নহে।"

ভাওয়াল এবং কাশীমপুর অঞ্চলে বহু কোচ এবং বংশী জাতীয় লোকের বাস। ইহারা পূর্ব্বকালে কোচবেহারের এবং নেপালের অধিবাসী ছিল সন্দেহ নাই। কোন সময়ে ইহারা এইরূপ দলবদ্ধ হইয়া বঙ্গের এই অঞ্চলে বাস করিতে আরম্ভ করে, তাহা প্রণিধানযোগ্য বিষয়। ইহাদের পূজা পার্ব্বণাদিতে অনেক বৌদ্ধ রীতির আভাস অতি সুস্পষ্টরূপে বর্ত্তমান। ইহারা অত্যন্ত নির্ভীক প্রকৃতি, সরল এবং বিশ্বাসী। আহোম এবং কোচগণ বহুবার লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করে। দিনাজপুর স্তম্ভলিপি হইতে "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি"র অধীনে নেপালবাসীগণ কর্ত্তৃকও বঙ্গবিজয় বার্ত্তা আমরা প্রাপ্ত হই। সম্ভবতঃ, এই সকল আক্রমণের পর বিদেশীয় ব্যক্তিগণ দলবদ্ধ হইয়া এই অঞ্চলে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে, এবং তদবধি ইহারা এই প্রদেশেরই অধিবাসী হইয়া গিয়াছে।

শিশুপাল অথবা তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কাহার রাজত্বকালে এ অঞ্চলে নিম্নজাতীয় ব্যক্তিগণের প্রভাব

বিস্তৃত হয়, এবং বিদেশীয়দিগের আক্রমণ এবং লুণ্ঠন ব্যাপার আরম্ভ হয়, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন।

পূর্ব্বে শিশুপালের যে সমুদয় কীর্ত্তি চিহ্নের বিষয় উল্লিখিত হইল, তদ্ব্যতীত ভাওয়ালের আরও বহু স্থানে এই নৃপতির কীর্ত্তি চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। কিন্তু, ঐ সমস্ত স্থান নিবিড় অরণ্যাবৃত হওয়াতে অতিশয় দুর্গম, সুতরাং, সমস্ত স্থানের সন্ধান পাওয়াও দুঃসাধ্য।

যশোপাল।

যশোপাল রাজার কীর্ত্তি চিহ্নাদি মাধবপুর এবং তৎসন্নিহিত বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। মুসলমান গাজীদিগের রাজত্বকালে মাধবপুরের নাম গাজীবাড়ী হইয়াছে, এবং অদ্যাপি ঐ গ্রাম উক্ত নামেই পরিচিত। যশোপালের গৃহদেবতা মাধবের নামানুসারেই বোধ হয় যশোপালের রাজধানীর নাম মাধবপুর হইয়াছিল। এই বিগ্রহের বিবরণ পরে উক্ত হইবে।

গাজীবাড়া গ্রাম চাঁদপ্রতাপ ও তালিপাবাদ পরগণার মধ্যবর্ত্তীস্থলে অবস্থিত। গাজীবাড়ী গাজাখালি নামক নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে গাজাখালি নদী ঢাকার একটী প্রধান নদী বলিয়া পরিগণিত ছিল। রেণেলের মানচিত্রে আমরা যে কানাই নদী দেখিতে পাই, সেই কানাই নদীর সহিত বংশাই নদার একটী প্রবাহের সম্মিলনের ফলে গাজীখালি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। গাজীখালির পূর্ব্বদিকে নদীতীরে হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যশোপালের বড় দীঘি ও ছোট দীঘি নামে খ্যাত দুইটী বৃহৎ দীর্ঘিকা বর্ত্তমান। উভয় দীর্ঘিকাই “জান” (সংযোজক পয়ঃ প্রণালী) দ্বারা একটী বিলের সহিত সংযুক্ত। শীতকালেও উভয় দীর্ঘিকাতে গভীর জল থাকে। উভয় দীর্ঘিকাই উত্তর দক্ষিণে খোদিত ও পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত; এই উভয়ের পরস্পর ব্যবধান বোধ হয় ৪০০ গজের অধিক হইবে না।



মাধবপুরের বড়দীঘি



মাধবপুরের ছোটদীঘি

E. B. P. & P. House, Dacca.

বড় দীঘি ও ছোট দীঘি এতদুভয়ই আনুমানিক একখাদা (৩৭৫ হাত × ২০০ হাত) পরিমাণ বিস্তৃত। বড় দীঘিতে বাঁধান ঘাটের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই, বোধ হয় কাল-বশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ছোট দীঘির উত্তর তটে এখনও ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাটের সুস্পষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হয়। বড় দীঘি ও ছোট দীঘি আধুনিক নাম, দীর্ঘিকা-দ্বয়ের প্রাচীন নাম জানা যায় না।

দীর্ঘিকাদ্বয়ের উত্তর তটে এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও বাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ছিল; গ্রামস্থ বহু প্রাচীন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ঐ সমস্ত গ্রামে বসতি হওয়াতে গ্রামবাসিগণ ক্রমে তাহা সমতল করিয়া ফেলিয়াছে। যে স্থানে বাটী অবস্থিত ছিল, তথায় অদ্যাপি বহু ইষ্টক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত আছে। কৃষকগণ বলিল যে ইষ্টকের পরিমাণ এত অধিক যে তথায় হলচালন অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। গ্রামবাসিগণ রাজবাটীতে একটী ইষ্টকে বাঁধান বৃত্তাকার ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা প্রদর্শন করিয়া বলিল যে, প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে কোনও ব্যক্তি মৃত্তিকা খননকালে ঐ স্থানে পাত্রপূর্ণ বহু মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। স্থানীয় জমিদারের প্রধান কর্ম্মচারীও ঐ উক্তি সমর্থন করাতে উহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইল। যে ব্যক্তি ঐ গুপ্ত ধন পাইয়াছে, বহু অনুসন্ধানেও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, এবং পুরস্কার ঘোষণা করা সত্ত্বেও উহার একটী মুদ্রাও কেহ দিতে পারিল না। ঐ মুদ্রা পাওয়া গেলে হয় ত যশোপাল

রাজার লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের অনেক সহায়তা হইত। উক্ত ইষ্টক নির্ম্মিত চৌবাচ্চাটীর ইষ্টকগুলি এত পুরাতন, যে সামান্য অঙ্গুলির চাপেই উহা একেবারে গুঁড়া হইয়া যাইতে লাগিল।

রাজবাটীর চতুর্দ্দিকেই সুপ্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত। বাটীর দক্ষিণ দিকে বহুদূরব্যাপী বিল (জলাকীর্ণ স্থান). এবং অপর তিন দিকেই পরিখার সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। বড় দীঘির অব্যবহিত পশ্চিম হইতে পরিখা আরম্ভ হইয়া বাটীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করতঃ, ছোট দীঘির অব্যবহিত পূর্ব্ব দিক দিয়া বিলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পরিখার অপর দিকও বিলের সহিত সংযুক্ত। পশ্চিম দিকের এবং উত্তর দিকের পরিখায় বর্ষাকালে জল থাকে। উত্তর দিকের কিয়দংশ অনেক পরিমাণে ভরিয়া গিয়া একটী ক্ষুদ্র বাইদ্ (সজল নিম্নভূমি) রূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকের পরিখা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু. এখনও উহার সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। পরিখার পার্শ্বে স্থানে স্থানে মৃৎপ্রাকারের চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়।

যশোপালের বাটীর পশ্চিম দিকস্থ পরিখা হইতে অনুমান অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে গাজীখালি নদী প্রবাহিত। গাজীখালির পশ্চিম তীরে মাধবচালা বা মাধব টেক অবস্থিত; মাধব চালার দক্ষিণ দিকে পূর্ব্বোক্ত বিস্তৃত বিল। এই মাধবচালার প্রসঙ্গে এ স্থানে যশোপালের গৃহদেবতা মাধবের বিষয় উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। দেশপ্রচলিত প্রবাদ এই, একদা যশোপাল নৃপতি এক শ্বেত হস্তীপৃষ্ঠে কোনও স্থানে যাইতে ছিলেন। তাঁহার রাজধানীর অদূরেই

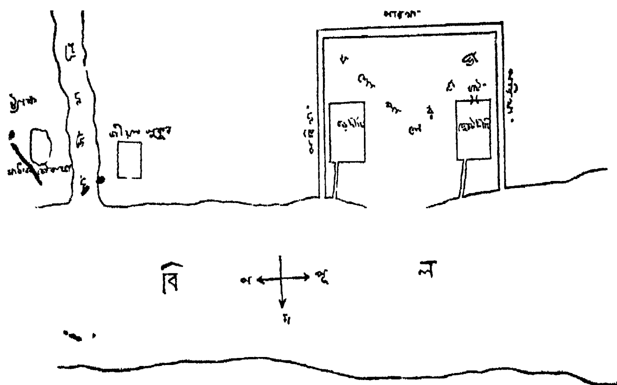
একটী স্থানে উপস্থিত হইয়া হস্তী হঠাৎ ভয় চকিভ ভাবে দণ্ডায়মান হইল, শত অঙ্কুশ প্রহারেও অগ্রসর হইল না, এবং শুণ্ড উত্তোলন করিয়া একটী স্থান পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিতে লাগিল। সুশিক্ষিত হস্তীর ঈদৃশ অদ্ভূত ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া রাজা ঐ স্থান খনন করিতে আদেশ দিলেন। রাজাদেশে বহুদূর খনিত হইলে একটী মন্দির এবং তন্মধ্যস্থ মাধব মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। তখন হঠাৎ দৈববাণী হয় যে, যশোপাল মাধবকে স্থানান্তরিত করিলে তাঁহার রাজ্য এবং বংশ নষ্ট হইবে। "যশোমাধব সংবাদে" মাধবমূর্ত্তির প্রাপ্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"মাটি কাটি শ্রীমন্দির বাহির করিল।
কপাট ভিতরে আটা খুলিতে নারিল॥
অতঃপর মহারাজা ব্যাকুল হইয়া।
তিন দিন অনাহারে রৈল হত্যা দিয়া॥
ভক্তি দেখি ভগবান নারিল থাকিতে।
দৈববাণী আসি তারে কৈল অলক্ষিতে॥
তোর বংশ থাকিবে না তুলিলে আমারে।
ধন বংশ চাও যদি ফিরে যাহ ঘরে॥
তমোপূর্ণ পৃথিবী দেখিয়া আমি ডরে।
লুকাইয়া আছি হেথা মৃত্তিকা ভিতরে॥"

ভক্ত নৃপতি ইহাতে বিচলিত হইলেন না; প্রত্যুত্তরে তিনি মাধবকে বলিলেন,—"তুমি মোর ধনবংশ তুমি শিরোমণি।" পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা পারলৌকিক সম্পদকেই অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া যশোপাল মাধবকে ঐ স্থান হইতে উত্তোলিত করিলেন, এবং তথায়

প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মাধবকে স্থাপিত করিলেন। যে স্থান হইতে মাধবকে উত্তোলিত করা হয়, সেই গর্ত্তটী এখনও বিদ্যমান, এবং "মাধবের চৌবাচ্চা" নামে খ্যাত। উহা একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর ন্যায় এবং প্রায় ২৫ হাত লম্বা ও ২০ হাত প্রশস্ত। যশোপাল যে স্থানে মাধবের মন্দির নির্ম্মিত করেন, সেই স্থান এখন "মাধব চালা" অথবা "মাধব টেক্" নামে খ্যাত, এবং তাহারই মধ্যে "মাধবের চৌবাচ্চা" অবস্থিত। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখন বর্ত্তমান নাই, কিন্তু সমস্ত টেক্‌টীতে (উচ্চ ভূমিতে) বহু ইষ্টক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত থাকিয়া অতীত কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দৈববাণী কার্য্যে পরিণত হইয়া যশোপাল নির্ব্বংশ হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য নষ্ট হইল। ভক্তের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মাধব তদবধি নিজ নামের পূর্ব্বে ভক্তের নাম সংযোগ করিয়া 'যশোমাধব' নামে খ্যাত হইলেন। "বংশ গেল যশোনাম মাধবে মিলিল।" যশোপালের রাজ্যবিনাশের পর তাঁহার রাজধানীও ক্রমে জনশূন্য হইয়া গেল। মাধব বোধ হয় অনাদৃত অবস্থাতেই তথায় অনির্দ্দিষ্ট কাল অবস্থান করেন। পরে স্থানীয় জনৈক জমিদার গোবিন্দপ্রসাদ রায় বন মধ্যে সেই মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া শিমুলিয়া গ্রামস্থ জনৈক ব্রাহ্মণকে উহা দান করেন। পরে সেই ব্রাহ্মণ নিজ জামাতা ধামরাইর পার্শ্ববর্ত্তী 'পঞ্চাশ' নামক পল্লীবাসী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ রাম জীবন রায় মৌলিককে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ (?)



মাধবপুরস্থ প্রাসাদ এবং মাধব মন্দির প্রভৃতির আনুমানিক মানচিত্র



মাধবের চৌবাচ্চা

E. B. P. & P. House, Dacca.

উক্ত মূর্ত্তি দান করেন। তদবধি মাধব যশোমাধব নামে ধামরাই গ্রামে উক্ত মৌলিক বংশেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। মৌলিক মহাশয়দের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে ১০৭৯ বঙ্গাব্দে (খৃঃ ১৬৭২) মাধব মূর্ত্তি তাঁহাদের হস্তগত হয়। মৌলিক মহাশয়দের নিকট যে দুইখানা প্রাচীন দলিল আছে, (২০) তাহা হইতে জানা যায় যে, যশোমাধব পূর্ব্বে কুমরাল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তৎকালে রামশর্ম্মা, ভগীরথ শর্ম্মা, ও রাধাবল্লভ শর্ম্মা ঠাকুরের সেবাইত নিযুক্ত ছিলেন, এবং রামজীবন মৌলিক "পুরুষানুক্রমে সেবার সরবরাহ" করিতেন। আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বকালে তিনি হিন্দুর সমস্ত দেব-দেবীমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া দিতে আদেশ প্রদান করেন। মুসলমানগণের অত্যাচারের ভয়ে পূজারীগণ এবং রামজীবন মৌলিক গোপনে মাধব বিগ্রহ মন্দির হইতে মৌলিক মহাশয়ের নিজবাটীতে স্থানান্তরিত করেন। তদবধি মাধব তথায়ই বিরাজ করিতেছেন। মৌলিক মহাশয়দের ভদ্রাসনবাটী পূর্ব্বে 'ঠাকুর বাড়ী পঞ্চাশ' গ্রামেই ছিল, এবং উহাই আদি ধামরাই। পরবর্ত্তী কালে বর্ত্তমান স্থানে মাধবকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই স্থান পূর্ব্বে বনাকীর্ণ ছিল। 'ঠাকুরবাড়া পঞ্চাশে' "মাধববাড়ীর ঘাট" বলিয়া একটী ঘাট অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উহার সন্নিকটেই মাধবের পুরাতন মন্দির অবস্থিত ছিল।

---

(২০) এই দলিল দুইখানার নকল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত "ঢাকার ইতিহাস" প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় দলিলই ১০৭৯ বঙ্গাব্দে লিখিত।

নবাবী আমলের কাগজ পত্রে "মাধব বাড়ীর ঘাট" বলিয়া ঐ স্থান চিহ্নিত হইয়াছে।

মাধবের নামে বহু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে; তাহার আয়দ্বারা প্রত্যহ মাধবের ষোড়শোপচারে পূজা হয়। ধামরাইর মাধবের রথযাত্রা দেশ বিখ্যাত; ঐ সময়ে ধামরাইতে প্রায় লক্ষ লোক সমবেত হয়। বিচিত্র বসনভূষণ ও প্রভূত স্বর্ণালঙ্কার সজ্জিত মাধবমূর্ত্তি বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। এরূপ সুন্দর মূর্ত্তি এতদ্দেশে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

মাধব সম্বন্ধে আরও বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মাধবমূর্ত্তি দারু নির্ম্মিত এবং নবজলধরশ্যামবর্ণ। কথিত আছে, যে কাষ্ঠ খণ্ডদ্বারা শ্রীক্ষেত্রধামের জগন্নাথ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, তাহারই অবশিষ্টাংশ দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা মাধব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। মাধবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে লিখিত আছে:—

"অর্দ্ধমূর্ত্তি রাখি বিশ্বকর্ম্মা মহামতি।
চলে গেল নিজস্থানে হয়ে ক্ষুণ্ণমতি॥
তারপর শুনহ অদ্ভুত বিবরণ।
যেমনে মাধবমূর্ত্তি হইল গঠন॥
জগন্নাথ নিরমিয়া যে কাষ্ঠ আছিল।
গৃহে আনি যত্নে তারে মূরতি গঠিল॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চতুর্ভুজধারী।
কস্তার শোভিত কর মাধব মুরারি॥
পদতলে নিরমিল রক্ত শতদল।
রবি শশি যার তেজে করে ঝলমল॥



ধামরাইর শ্রীশ্রীযশোমাধব

E. B. P. & P. House, Dacca.

ক্ষীরোদসাগর শয্যা অনন্ত আসন।
কিরীট কুণ্ডল আর রত্ন আভরণ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দোহে করে পদসেবা।
দশ অবতার দিল লীলা বোঝে কেবা॥
কপালে মাণিক দিল সূর্য্য কোন ছার।
করিয়াছে চুরি যাহা পাণ্ডা দুরাচার॥
হিরণ্য গর্ভের যেবা বুদ্ধি দিয়াছিল।
সেই মূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মা অভেদ গড়িল॥
গড়িয়া বিরলে মূর্ত্তি সহস্র বৎসর।
পূজা করে মর্ত্ত লোকে, নাহি জানে নর॥"

পৃথিবী তমোপূর্ণ দেখিয়া ভয়ে মাধব মৃত্তিকানিম্নে অবস্থান করিতেছিলেন. পরে তাঁহাকে যশোপাল তথা হইতে উত্তোলিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, মাধব প্রতিষ্ঠার পর যশোপালের উপর স্বপ্নাদেশ হয় যে, মাধবের স্ত্রী তখনও সেই গর্ত্তমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। যশোপালের আদেশে পুনরায় সেই গর্ত্ত খনন কালে খননকারীদের অনবধানতাবশতঃ খনিত্রের আঘাতে মাধবের স্ত্রীর নাসিকা ভগ্ন হইয়া যায়! ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূপ্রোথিতা হইলেন, বহু চেষ্টাতেও আর তাঁহাকে পাওয়া গেল না।

কথা প্রসঙ্গে যশোমাধবের প্রতিষ্ঠা-স্থান ধামরাই গ্রামের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বোধ হয় এ স্থানে নিতান্ত অপ্রাসাঙ্গিক হইবে না। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় ধামরাই সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র

সেন মহাশয় যাহার সমর্থন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

বসু মহাশয় বলিতেছেন,—"বহু দিবস হইল সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ধামরাই নামক প্রাচীন গ্রামের নাম শুনিয়া তৎকালে বলিয়াছিলাম যে ঐ স্থান ধর্ম্মরাজিকা শব্দের অপভ্রংশ। মৌর্য্য সম্রাট অশোক ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে অশোকাবদান হইতে এইরূপ প্রমান পাইয়াছি। "অশোকো নাম রাজা বভূবেতি। তেন চতুরশীতি-ধর্ম্মরাজিকাসহস্রং প্রতিষ্ঠাপিতং। যাবৎ ভগবচ্ছাসনং প্রাপ্যতে তাবৎ তস্য যশঃ স্থাস্যীৎ।"

বসু মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন একখানি প্রাচীন দলিলের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। "সম্প্রতি ধামরাইবাসী শ্রীযুক্ত কামাখ্যা প্রসাদ বসু, বি, এল্, মহাশয় একখানি ৩০০ বৎসরের প্রাচীন দলিল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ধামরাই গ্রামের প্রাচীন নাম ধর্ম্মরাজিই ছিল। ধর্ম্মরাজি চলিত ভাষায় ধামরাই হইয়াছে। উক্ত অশোকাবদান হইতে জানিতে পারি যে, সম্রাট অশোক যে সকল ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন, পুষ্পমিত্র সেই সকল ধ্বংস করেন। ধামরাই গ্রামে এইরূপ কোন ধর্ম্মরাজিকা ছিল, তাহা হইতেই এই স্থানের ধর্ম্মরাজিকা নামকরণ হইয়া থাকিবে।" (২১)

(২১) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৯।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় তৎপ্রণীত "ঢাকার ইতিহাসে" উল্লিখিত দলিলখানির নকল প্রকাশিত করিয়াছেন।

শাকাসর গ্রামে সম্প্রতি একটী প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। ধামরাই হইতে শাকাসর অধিক দূরবর্ত্তী নহে। ধামরাই গ্রামে অশোকের ধর্ম্মরাজিকা অবস্থিত ছিল, ইহা প্রমাণিত হইলে, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, শাকাসরে প্রাপ্ত স্তম্ভটীই হয়ত ধামরাইর ধর্ম্মরাজিকা স্তম্ভ ছিল। কালক্রমে উহা ভূপতিত হইয়াছে, এবং হয়ত পরে উহা কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তী শাকাসর গ্রামে নীত হইয়া গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক বনদেবতা জ্ঞানে পূজিত হইতেছে। এইরূপ অনুমান করিবার অন্য একটী কারণ এই যে, এইরূপ প্রস্তরস্তম্ভ পূর্ব্ববঙ্গের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের অশোক স্তম্ভের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

যশোপালের রাজধানী মাধবপুর (গাজীবাড়ী) এবং মাধব মন্দির (আধুনিক 'মাধব চালা') হইতে কিয়দ্দূরে বাইদ্গাও নামক গ্রামে জীয়স পুষ্করি .. নামে একটী দীর্ঘিকা আছে। সাধারণের বিশ্বাস, যে গাভী অতি অল্প পরিমাণ দুগ্ধ প্রদান করে, তাহার কিঞ্চিৎ জীয়স পুষ্করিণীতে দিলে গাভী দুগ্ধবতী হয়। উক্ত জলাশয়ের আরও বহু দৈবী ক্ষমতার নানাবিধ গল্প সাধারণ্যে প্রচলিত আছে। জীয়স নামধেয় বহু পুষ্করিণী বঙ্গের সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, ঐ জলাশয়-সমূহে বৌদ্ধযুগে ধর্ম্মের কোনরূপ প্রক্রিয়াদি সাধিত হইত। (২২) এই অনুমানের কোন কারণ তিনি উল্লেখ

(২২) শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন।—প্রবাসী,—আষাঢ়, ১৩১৯।

করেন নাই। যাহা হউক, প্রবাদ এই যে, বাইদ্‌গাও গ্রামস্থ জীয়স পুষ্করিণী যশোপালের খনিত।

বাইদ্‌গাওর সন্নিকটে কাউনদিয়ার দীঘি নামক আর একটি অতি বৃহৎ জলাশয় বর্ত্তমান। কাউনদিয়া গ্রামের নামানুসারেই উক্ত দীর্ঘিকার নাম হইয়াছে। উহার প্রাচীন নাম জানা যায় না। এই দীর্ঘিকাটি যশোপালের রাজধানীস্থিত বড়দীঘি ও ছোটদীঘি হইতেও বৃহত্তর,—প্রায় উহাদের দ্বিগুণ হইবে। এই জলাশয়ও যশোপালের খনিত, এইরূপ প্রবাদ।

মাধবপুরের সন্নিকটে গণকপাড়া গ্রাম বর্ত্তমান। গণকপাড়া এবং গৌরীপাড়া রেণেলের (Rennel) মানচিত্রে বৃহৎ এবং বিখ্যাত স্থান বলিয়া চিহ্নিত। নদীর গতি এই স্থানে বহু পরিবর্ত্তিত হওয়াতে উহার প্রায় সমস্তই নদী স্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। টেলর্ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়েরও কতিপয়বর্ষ পূর্ব্বে গৌরীপাড়াতে দুর্গ প্রাকার সমূহের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ছিল। (২৩) টেলরের সময়ের পূর্ব্বেই তাহা নদীকবলিত হয়। প্রবাদ এই, গ্রামদ্বয়ে রাজগণকগণ বাস করিতেন, এবং এখানেও যশোপালের রাজপ্রাসাদ বর্ত্তমান ছিল। এখনও এস্থানে বহু ইষ্টকাদি এবং সময়ে সময়ে নানা কারুকার্য্যখোদিত ইষ্টকও দৃষ্ট হয়। হিন্দু রাজত্বের অবসানের পরও এইস্থান সুবিখ্যাত ছিল। বঙ্গের পাঠান নৃপতি মোগল কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া এই প্রদেশেই বহুদিন

(২৩) Taylor's 'Topography and Statistics of Dacca.' —Page 117.

লুক্কায়িত থাকেন, এবং ওসমানের অধীনে পাঠানগণ এইস্থানে সমবেত হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে অনেক খণ্ডযুদ্ধ করেন। তাঁহারা গণকপাড়াতে দুর্গ এবং বাসভবনাদি নির্ম্মাণ করেন। ধামরাইর নিকটে পাঠানতলি নামক গ্রাম এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কথিত আছে, ইসলাম খাঁ যখন বঙ্গের রাজধানী পূর্ব্ববঙ্গে স্থানান্তরিত করিতে কৃতসংকল্প হন, তখন তিনি গণকপাড়াতেই বঙ্গের রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু উহা নিম্নভূমি এবং অস্বাস্থ্যকর বলিয়া ঢাকাতে রাজধানী স্থাপিত হয় (২৪)। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে, ইসলাম খাঁর পূর্ব্বেও, অর্থাৎ হিন্দু রাজত্বের সময় হইতেই গণকপাড়া সুবিখ্যাত স্থান ছিল, নচেৎ এ স্থানে সমগ্র বঙ্গদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব হওয়া অসম্ভব।

গড় কাশীমপুর হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত জরুন এবং সুরাবাড়ী নামক পল্লীদ্বয়ে যশোপালের কীর্ত্তি-চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়।

জরুন গ্রামে কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একটি প্রাচীর দৃষ্ট হয়। পরে আরও বিস্তৃত ভাবে ঐ স্থান খনন করাতে বহু অট্টালিকার চিহ্নাদি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রবাদ এই, ঐ স্থানে

---

(২৪) Taylor's 'Topography and Statistics of Dacca.' —Page 114.

যশোপালের বাসভবনাদি ছিল। কালবশে উহা ভূ-প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। সুরাবাড়ী গ্রামেও ৪।৫ মাস পূর্ব্বে মৃত্তিকা খননকালে একটি অট্টালিকার ভূপ্রোথিত ভগ্নাবশেষ বহির্গত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্ববঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপাল, যশোপাল, শিশুপাল, প্রভৃতি পাল রাজগণের যে সমস্ত কীর্ত্তি-চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়, তাহার সমস্ত স্থানের ইষ্টক সমূহ, দুর্গ প্রাকার, এবং পরিখা প্রভৃতিতে অত্যাশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সুরাবাড়ী, জরুন, মাধবপুর, একডালা, সাভার প্রভৃতি সমস্ত স্থানই আমি দর্শন করিয়াছি, এবং সমস্ত স্থানের ইষ্টকাদিই আমার নিকট সংগৃহীত আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থানের বিষয় উল্লিখিত হইল, তদ্ব্যতীত বড়ইবাড়ী গ্রামে যশোপালের বহু কীর্ত্তি-চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। এ স্থানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড়ইবাড়ী গ্রামটি তুরাগ নদীর উপর অবস্থিত, নদীর তীর হইতে বর্ত্তমান বড়ইবাড়ী গ্রাম প্রায় এক মাইল উত্তর দিকে। গ্রামের উত্তরে একটি সমুন্নত ভূমিখণ্ডের উপর যশোপালের কীর্ত্তি-চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। ঢোল সমুদ্র সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। এরূপ সুবৃহৎ দীর্ঘিকা এ অঞ্চলে অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রায় তিন খাদা ভূমির উপর এই সুবিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা বিরাজমান। ইহার গভীরতাও সুপ্রসিদ্ধ; শীত কালেও ইহাতে প্রায় ১৫।২০ হাত জল থাকে। কথিত আছে যে, দীর্ঘিকার নিম্ন হইতে ঢোল বাজাইলে উপর হইতে তাহার শব্দ শুনা না যায়,

যশোপাল নৃপতি এইরূপ গভীর করিয়া এই দীর্ঘিকা খনন করিতে আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে ইহার নাম ঢোলসমুদ্র হইয়াছে। এই প্রবাদ বাক্য মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। কিরূপ গভীর করিয়া খনন করিলে, জীর্ণ সংস্কার ব্যতীতও, খননের প্রায় সহস্র বৎসর পরে শীতকালে দীর্ঘিকাতে ১৫।২০ হাত জল থাকিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ঢোল সমুদ্রের উত্তর ও পশ্চিম দিকে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

ঢোল সমুদ্র হইতে অনতিদূরে কোটামণি নামক আর একটী দীর্ঘিকা বর্ত্তমান। ইহা ঢোল সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ না হইলেও, ক্ষুদ্র নহে। ইহাও প্রায় এক খাদা ভূমির উপর খনিত। কোটামণির পশ্চিম দিকে ঘাটের চিহ্ন বর্ত্তমান। এই জলাশয়ের পশ্চিম তটে রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে বহু ইষ্টক চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। মধ্যস্থলে একটি ভগ্ন স্তূপ আছে; উহার ব্যাস প্রায় ১০।১২ হাত। শুনা যায়, রাজবাটীর সন্নিহিত স্থনে হল-চালনা কালে কৃষকগণ মুদ্রাদি, ইষ্টক, অথবা প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমরা বহু অনুসন্ধানেও বড়ইবাড়ী হইতে কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

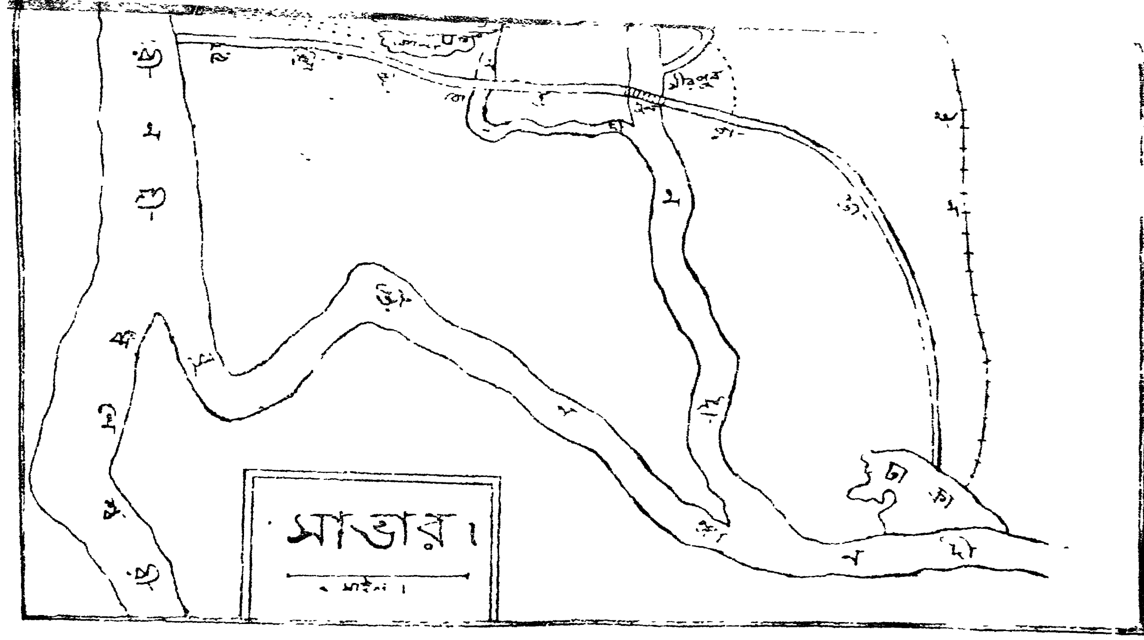
রাজবাটীর অভ্যন্তরে কোটামণি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে আর একটি অনতিবৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। উহা রাজান্তঃ-পুরান্তর্বর্ত্তী ছিল, এইরূপ প্রবাদ। এতদ্ব্যতীত বড়ইবাড়ীতে আর একটি পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে; তাহাও বেশী

বড় নহে। ঐ জলাশয়ে রাজার হস্তী স্নান করান হইত, এইরূপ জনশ্রুতি।

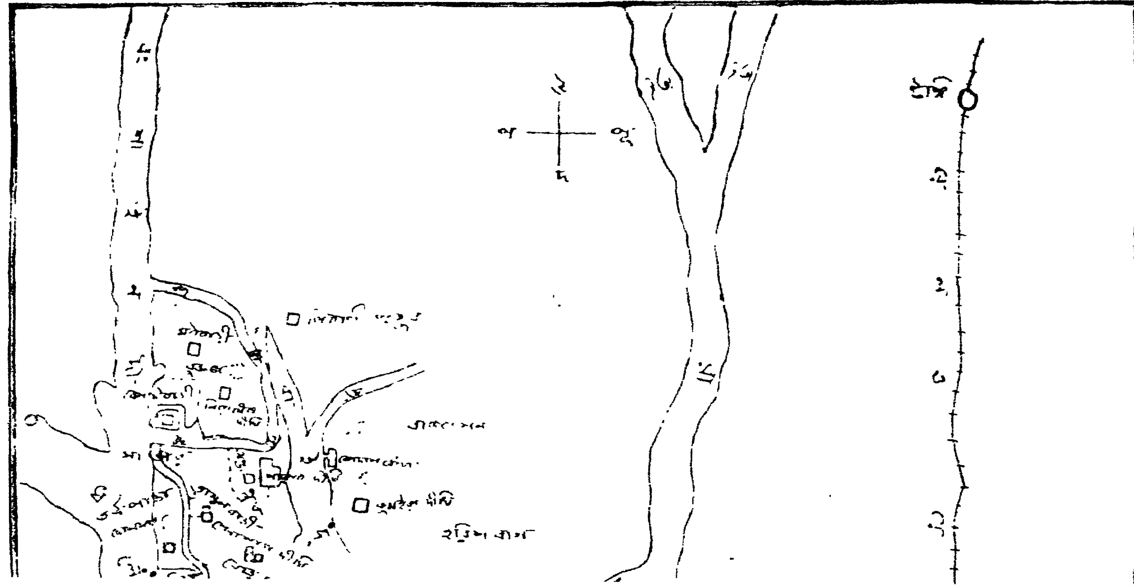
বড়ইবাড়ী হইতে প্রায় চারি মাইল উত্তরে জাঠিলিয়া গ্রামে যশোপাল-খনিত আর একটি দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। উহাতেও একটি বাঁধান ঘাটের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান

জাঠিলিয়া হইতে কয়েক মাইল উত্তরে বজ্রুরি নামক গ্রাম। এখানেও যশোপালের বাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। রাজবাটীর পূর্ব্বে ও দক্ষিণে দুইটী দীঘিকা আছে, এবং তাহাতে বাধান ঘাটের চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়।

এ অঞ্চলে যশোপাল রাজার কীর্ত্তি-চিহ্নাদির বিবরণ আমি যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, উপরে তাহা বিবৃত হইল। এতদ্ব্যতীত অরণ্যাভ্যন্তরে হয়ত আরও বহু ধ্বংস-চিহ্নাদি বর্ত্তমান আছে।


সাভার।

প্রতি৬



হরিশ্চন্দ্র পাল

ঢাকা নগরীর প্রায় ১৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে ধলেশ্বরী তীরে সাভার গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানে ধলেশ্বরীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি স্বতঃই প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দেয়। সাভারের অনতিদূরে বিভিন্ন স্থানে বংশাই নদী এবং ঢাকা নগরীর নিম্নবাহিনী বুড়িগঙ্গা নদী ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তিনটি বৃহৎ নদীর প্রায় সঙ্গম স্থলে অবস্থিত হওয়াতে, সাভার স্বভাবতঃই বাণিজ্য-প্রধান স্থানের উপযোগী, এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম। কাশীমপুর পরগণার প্রায় সীমান্ত ভাগে অতি উচ্চ ভূমির উপর সাভার অবস্থিত।

এই সাভারে এবং ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে হরিশ্চন্দ্র রাজার বহু কীর্ত্তি চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। সাভার রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের রাজধানী ছিল। ইহার প্রাচীন নাম সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

"অক্ষাং ২৩° ২৫′ ৫৫″ উঃ, দ্রাঘিং ৯০° ১৭′ ১০″ পূঃ। (২৫)

"বংশাবতী পূর্ব্ব তীরে সর্ব্বেশ্বর নগরী,
বৈসে রাজা হরিশ্চন্দ্র জিনি সুরপুরী॥"

এই পয়ারটি সাভারে লোকমুখে শুনিয়াছি। ইহার উপর আস্থা স্থাপন করিলে সাভারের প্রাচীন নাম

(২৫) বিশ্বকোষ।

সর্ব্বেশ্বর এইরূপ অনুমিত হয়। কিন্তু কাহারও মতে সাভারের প্রাচীন নাম সম্ভার। (২৬) আপাততঃ যে পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, তাহাতে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে।

কথিত আছে, হরিশ্চন্দ্র গৌড় হইতে সসৈন্যে আগমন করিয়া সাভারে রাজ্য স্থাপন করেন। বিশ্বকোষকার অনুমান করেন যে, "যে সময় সেনরাজগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে, অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি পালরাজগণ বিক্রমপুর হইতে মানিকগঞ্জের অন্তর্গত দাসোড়া পর্য্যন্ত ভূভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।" (২৭) এই উক্তির কোনরূপ প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই; সুতরাং হরিশ্চন্দ্র রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধেও কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা সুকঠিন।

সাভার এবং তৎচতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ নিয়া হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজধানীতে হরিশ্চন্দ্র খনিত এত দীর্ঘিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান যে, অন্যান্য অঞ্চলে একটা পরগণাতে ইহার অর্দ্ধেক সংখ্যক জলাশয়ও দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র তদীয় রাজধানীতে "কুড়ি বুড়ি" (৪০০ শত) দীর্ঘিকা খনন করেন, তন্মধ্যে রাজ বাটীর চতুর্দ্দিকে ১২॥ গণ্ডা (৫০) এবং রাণী কর্ণাবতীর ভবনে (আধুনিক

---

(২৬) শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার রায় বি, এ। প্রতিভা কর্ত্তিক, ১৩১৯।

(২৭) বিশ্বকোষ।



সাভারের সাগরদীঘি এবং তাহার পশ্চিম তটস্থ রাজ বাটীর ভগ্নাবশেষ।

E. B. P. & P. House, Dacca

কর্ণ পাড়ায়) ৭॥ গণ্ডা (৩০টা) দীর্ঘিকা খনিত হয়। প্রকৃত পক্ষে সাভার অঞ্চলে এখনও এত জলাশয় দৃষ্ট হয় যে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ বাক্য নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

আমরা বহুসংখ্যক দীর্ঘিকার নাম সংগ্রহ করিয়াছি; নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। প্রবাদবাক্যানুসারে যে চারিশত দীর্ঘিকা খনিত হয়, খননের প্রায় সহস্র বৎসর পরে, অধুনা তাহার অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে, কতকগুলি "বাইদ্" (নিম্ন ভূমি) এবং ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বোধ হয় সাভারে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে, অর্থাৎ প্রাচীন রাজধানীর সীমার মধ্যে অদ্যাপি প্রায় ২০০ দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশেরই কোন নাম নাই, সুতরাং তাহা তালিকা-ভুক্ত করা গেল না। যেগুলির নাম আছে, তাহাদেরও প্রায় অনেক নামই আধুনিক; হয়ত অবস্থান, প্রচলিত প্রবাদ, এবং সন্নিহিত গ্রামের নামানুসারেই পরবর্ত্তী কালে তাহাদের নামকরণ করা হইয়াছে। নিম্নে দীর্ঘিকা-সমূহের দীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইল; এবং অধিকাংশ নামের পার্শ্বে, ইহা যে গ্রামে অবস্থিত, তাহারও নাম লিখিত হইল।

১। সাগর দীঘি। দীর্ঘিকা-সমূহের মধ্যে ইহার নামই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ইহা অতি বৃহদায়তন এবং অদ্যাপি ইহাতে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন বর্ত্তমান। ইহার পশ্চিম তটে রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান সাগরদীঘি 'আইচের নন্দা' (মজিদপুর) গ্রামে অবস্থিত।

২। কেলি সরোবর। মজিদপুর গ্রামে সাগরদীঘির পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা অন্তঃপুরস্থিত ছিল, এবং রাজ্ঞীগণ ইহাতে জলকেলি করিতেন, এইরূপ প্রবাদ। দীর্ঘিকাটি প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে।

৩। নিরামিষ দীঘি। জালেশ্বর গ্রামে সাগর দীঘি হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রবাদ এই, ইহা বিধবা রাজ-মাতার জন্য খনিত হইয়াছিল। মৎস্য-স্পর্শে জল অপবিত্র হইবার আশঙ্কায় ইহাতে কোন মৎস্য থাকিতে দেওয়া হইত না। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ বলেন যে, এই জলাশয়ের এরূপ কোন গুণ আছে, যদ্দ্বারা ইহাতে জীবিত মৎস্য ছাড়িয়া দিলেও অচিরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

৪। মঠবাড়ীর দীঘি। ভাটপাড়া গ্রামে "বুরুজের" (ইহার বিষয় পরে উক্ত হইবে) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। কথিত আছে, রাজস্থাপিত মঠ এই জলাশয়ের তীরেই স্থাপিত ছিল; তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। এই মঠ হইতেই বোধ হয় দীর্ঘিকার নাম-করণ হইয়াছে।

৫। দুই সতীনের দীঘি। মজিদপুর গ্রামে অব-স্থিত। দুইটি দীর্ঘিকা এক স্থানে খনিত। রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুই মহিষী কর্ণাবতী এবং ফুলবতীর স্মরণার্থই বোধ হয় ইহা খনিত হইয়াছিল।

৬। কোদাল ধোয়া দীঘি। আড়াপাড়া গ্রামে অবস্থিত। কথিত আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র একদা দুর্ভিক্ষ-

পীড়িত প্রজার সুবিধা ও জলকষ্ট নিবারণের জন্য এক রাত্রির মধ্যে বহুসংখ্যক দীর্ঘিকা খোদিত করান। খননকারিগণ এই দীর্ঘিকায় তাহাদের কর্দ্দমাক্ত কোদাল (খনিত্র) ধৌত করিয়াছিল; তাহা হইতেই এই নামের উৎপত্তি।

৭। দোয়াত ধোয়া দীঘি। এই স্থানে রাজকর্ম্মচারিগণ দোয়াত ধৌত করিতেন; তজ্জন্যই এই নামের উৎপত্তি। ইহা বাগুইলপুর গ্রামে অবস্থিত।

৮। ছোবামারা পুষ্করিণী। জ্ঞানেশ্বর গ্রামে অবস্থিত। রাজার তৈজসপত্রাদি 'ছোবা' সাহায্যে এই জলাশয়ে ধৌত করা হইত, এই রূপ প্রবাদ।

৯। কুমইরা পুষ্করিণী। কথিত আছে, ইহাতে পূর্ব্বে কুম্ভীর ছিল। সাগর দীঘির পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত, মধ্যে মাত্র একটি বাইদ ব্যবধান।

১০—১৬। সাত পুকুর। জামসিন গ্রামে সাতটি পুকুর এক স্থানে অবস্থিত আছে। মধ্য স্থানের জলাশয়টি বেশ বিস্তৃত ও গভীর, অন্যগুলি প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

১৭। ধোপাখোলার পুকুর। সাধাপুর গ্রামে অবস্থিত, রাজ-রজকের জন্য খনিত।

১৮। মালী পুকুর। সাধাপুর গ্রামে অবস্থিত। মালীর ব্যবহারের জন্য খনিত।

১৯। কুমার পুকুর। সাধাপুর গ্রামে অবস্থিত। কুম্ভকারের সম্পত্তি।

২০। তাম্বুল বাড়ীর পুষ্করিণী। কর্ণপাড়া গ্রা

অবস্থিত। দোলমঞ্চ, তাম্বুল বাড়ী এবং রাজ-গুরুর আশ্রমের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বর্ত্তমান।

২১। সেনা বাড়ীর দীঘি। কর্ণপাড়াস্থিত; প্রাচীন সেনানিবাসের অন্তর্ভূত।

২২। রাজ-গুরুর পুষ্করিণী। কর্ণপাড়া গ্রামে অবস্থিত। ইহার পশ্চিম দিকে রাজগুরুর আশ্রম বর্ত্তমান ছিল।

২৩। শ্মশান পুকুর। মানুষপোড়া টেকের সংলগ্ন শ্মশান-সন্নিহিত।

২৪। বেল গাছি পুকুর।
২৫। কলা গাছি পুকুর
২৬। বট গাছি পুকুর।
২৭। তাল গাছি পুকুর।
২৮। বড়ই গাছি পুকুর।

সেনাপাড়ার দক্ষিণে অবস্থিত। বোধ হয় সেনাগণের ব্যহারের জন্য খনিত হইয়াছিল। নাম শেষে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

২৯। জীয়স পুষ্করিণী। প্রবাদ এই, ইহাতে দুগ্ধ দিলে গাভী দুগ্ধবতী হয়, ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন, জীয়স পুষ্করিণী নামধেয় জলাশয় গুলিতে কোনরূপ বৌদ্ধ ক্রিয়াদি সম্পান্ন হইত।

৩০। চৌমাথা পুষ্করিণী। ভাটপাড়ার নিকটে রাজধানীর চারিটি সুপ্রশস্ত রাজপথের সঙ্গম-স্থলে এই জলাশয় খনিত হয়, এইরূপ প্রবাদ।

৩১। কবিরাজ পুষ্করিণী। সাভার।

৩২। ব্রহ্মচারীর পুষ্করিণী। সাভার।

৩৩। বড় আখরার দীঘি—সাভার (পুকুর পাড়)।

৩৪। শোলার দীঘি—বলি মেহার।

৩৫। দেব পুষ্করিণী—বলি মেহার।

৩৬–৩৮। তাল বাগের পুষ্করিণী—(পাশাপাশি তিনটি) বলিমেহার।

৩৯। সাত গাছি পুকুর—বলি মেহার।

৪০। লাল টেকির পুষ্করিণী—বলি মেহার।

৪১। বড় ফুরার পুষ্করিণী—বলি মেহার।

৪২। ছোট ফুরার পুষ্করিণী—আনন্দপুর।

৪৩। বন পুকুর—বাড্ডা।

৪৪। জলরি—বাড্ডা।

৪৫। কইঠার পুষ্করিণী—বাড্ডা।

৪৬। ইমাম বাড়ীর পুষ্করিণী—বাড্ডা।

৪৭। ইদ বাড়ীর পুষ্করিণী—বাড্ডা।

৪৮। লাল পুকুর—জালেশ্বর।

৪৯। চটীমারা পুষ্করিণী—জালেশ্বর।

৫০। আইচের পুষ্করিণী—ভাটপাড়া।

৫১। চৌধুরী বাড়ীর পুষ্করিণী—ভাটপাড়া।

৫২। ঠাকুর বাড়ীর পুষ্করিণী—ভাটপাড়া।

৫৩। ভাটপাড়ার দীঘি—ভাটপাড়া।

৫৪। চাইরা পুষ্করিণী—ভাটপাড়া।

৫৫, ৫৬। জোড় পুষ্করিণী—(পাশাপাশি দুইটি) গাওা।

৫৭। বিরিঞ্চির পুষ্করিণী—গাওা।

৫৮। রাজা বাড়ীর পুষ্করিণী—গাওা।

৫৯। পিঠালী পুকুর—নয়া বাড়ী।

৬০। বাঘার পুষ্করিণী—মদনপুর।

৬১। দীঘি—রাড়ী রাড়ী।

৬২। গারাক্ষেত শুখা পুষ্করিণী—রাজার নন্দা।

৬৩। দেয়পুকুর—জামসিন।

৬৪। ডাকাতমারা পুষ্করিণী—জামসিন।

৬৫। ছইলার পুষ্করিণী—ছইলা।

৬৬। মজুমদার বাড়ীর পুষ্করিণী—উলাইল।

৬৭। কানাইলালের পুষ্করিণী—কাৎলাপুর।

৬৮। বয়রা বাড়ীর পুষ্করিণী—বয়রা বাড়ী।

৬৯। শুখা পুষ্করিণী—মজিদপুর।

৭০। ইছামতী পুষ্করিণী—কর্ণপাড়া।

৭১। ক্ষিপ্রগতি সরোবর—ফুলবাড়িয়া।

৭২। খন্দকার পুকুর—কোণ্ডা, ইহার নামের উৎপত্তি পরে বর্ণিত হইয়াছে।

৭৩। রাজার পুকুর—বাগবাড়ী।

৭৪। সুখসাগর।

৭৫। রাজসাগর।

৭৬। ধন পুকুর।

৭৭। নির্ম্মূইলা পুকুর।

৭৮। পেট কাটা পুকুর।

৭৯। হাড়ি বাড়ীর পুষ্করিণী।

৮০। আন্ধার ডথা।

৮১। সলার (ঝাঁটা ধোয়া) পুকুর—কথিত আছে পুরবাসীগণের সম্মার্জ্জনী ধৌত করিবার জন্য এই জলাশয় খনিত হয়।

৮২। চৌমাচ্চা পুষ্করিণী।

৮৩। নাওগাড়া পুষ্করিণী।

৮৪। বেকাই পুষ্করিণী।

৮৫। কেউচার পুষ্করিণী।

৮৬। সাগর ডুগী।

৮৭। সাতবোয়াইলা পুকুর।

৮৮। নালার ঘোণা।

৮৯। আন্ধা পুকুর।

৯০। সানবান্ধা পুষ্করিণী—ইহাতে সুস্পষ্ট বাঁধান ঘাটের চিহ্ন বর্ত্তমান।

৯১। দাইতা বাড়ীর পুকুর।

৯২। সদুপালোয়ানের দীঘি।

৯৩। গজারিয়ার দীঘি।

৯৪। মরা পুকুর।

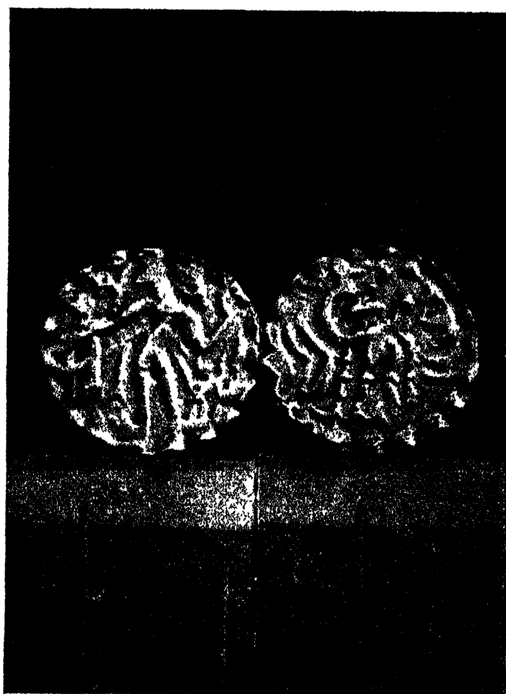
দীর্ঘিকার এই সুদীর্ঘ তালিকা হইতে সহজেই অনুমিত হইবে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী কিরূপ সুশোভিত, সমৃদ্ধিশালী, এবং বহুবিস্তৃত ছিল। সাভারের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রায় ত্রিশ থানি গ্রাম লইয়া হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী অবস্থিত ছিল, তাহা তৎথনিত দীর্ঘিকা সমূহের অবস্থান পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীয়মান হয়।

জলাশয় ব্যতীত হরিশ্চন্দ্রের আরও বহু কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

সাগর দীঘি সুবিস্তীর্ণ জলাশয়, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই বৃহৎ দীর্ঘিকার পশ্চিম তটে রাজবাটী এবং রাজান্তঃপুরের ভগ্নস্তূপাদি বর্ত্তমান। [চিত্র দ্রষ্টব্য]। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রায় ১৫।২০ হাত উচ্চ কয়েকটি ইষ্টকবহুল মৃত্তিকাস্তূপ এখন সেই সুবিশাল রাজপ্রাসাদের চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। স্তূপ-গুলি এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ এরূপ নিবিড় বনাকীর্ণ যে, এমন কি হস্তীরও তথায় প্রবেশ লাভ বহু আয়াসসাধ্য। হস্তী-পৃষ্ঠে আমরা বহু পরিশ্রমে এই স্থান দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছি। পরিদর্শকগণের পক্ষে এই সমস্ত স্থান দর্শন করিবার জন্য শীতকালই উপযোগী, কারণ তখন অরণ্যানী এত নিবিড় থাকে না।

স্তূপগুলির উপরিভাগে খালের ন্যায় লম্বা ৫।৬ ফিট প্রশস্ত, এবং সুগভীর বহু গর্ত্ত দৃষ্ট হইল। অনুসন্ধানে জানিলাম, সাভারের অধিকাংশ ধনী ব্যবসায়িগণই এই স্থান খনন করিয়া লব্ধ ইষ্টকসমূহ দ্বারাই স্ব স্ব বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এইরূপে অতীত ইতিহাসের শেষ চিহ্নসমূহও লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এই সমস্ত স্থান বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধানে খোদিত হইলে, অতীতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের বহু উপকরণাদি অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী বহু প্রাচীন ব্যক্তি বলিলেন যে, স্থানীয় ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক ঐ স্তূপসমূহ খনন কালে বহু প্রস্তরমূর্ত্তি, ইষ্টকমূর্ত্তি, খোদিত ও লিখিত ইষ্টক,



সাভারে প্রাপ্ত প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা

E. B. P. & P. House, Dacca.

কয়েকখানা স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত থালা এবং বহু গুপ্ত ধন অনেকে প্রাপ্ত হয়। এখনও কৃষকগণ হলচালনা-কালে প্রাচীন মুদ্রাদি, এবং মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু, অজ্ঞ কৃষকগণ ইহার মূল্য বুঝিতে না পারিয়া ইহা রক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করে না। আমরা বহু চেষ্টায় কয়েকটি প্রাচীন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি; ক্রমে যথাস্থানে তাহা উল্লেখ করিব।

এই স্থানে আমরা সংবাদ প্রাপ্ত হই যে, রাজবাটীর সন্নিকটস্থ একটি ক্ষেত্রে হলচালন-কালে কিয়দ্দিন পূর্ব্বে জনৈক দরিদ্র মুসলমান কৃষক ৩।৪টি অতি প্রাচীন স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া উহা সাভারের জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়াছে। তদনুযায়ী অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া, বহু চেষ্টায় এবং নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া উহার একটি স্বর্ণমুদ্রা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। [চিত্র দ্রষ্টব্য] সাভার এবং তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহু পল্লী হইতে আমরা বহু পরিশ্রমে এবং বহু অর্থ ব্যয়ে ৫।৬টি মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছি; উহার কোনটিই ৪০০ বৎসরের ন্যূন প্রাচীন নহে, কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণ মুদ্রাটি ভিন্ন অপর কোন মুদ্রার সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া উহাদের বিবরণ প্রদান করা অনাবশ্যক মনে করি।

সাভারে একটি প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, হরিশ্চন্দ্র রাজা অলক্ষ্মীমূর্ত্তি-অঙ্কিত মুদ্রা তাহার রাজ্যে প্রচলিত করেন, এবং তাহাতেই তিনি নির্ব্বংশ হওয়াতে তাঁহার ভাগিনেয় দামোদর তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। সাভা-

রের বহু ব্যক্তি আমাদের সংগৃহীত স্বর্ণ মুদ্রাটিকে হরিশ্চন্দ্রের সেই মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। মুদ্রাটির উভয় দিকেই দুইটি নগ্ন মূর্ত্তি অঙ্কিত, কিন্তু কোনরূপ লেখার চিহ্ন নাই। উহার প্রাচীনত্বের চিহ্ন উহার অঙ্গেই বর্ত্তমান, এবং অজ্ঞ কৃষক কর্ত্তৃক মৃত্তিকানিম্নে প্রাপ্ত হওয়াতে ইহার অকৃত্রিমতা প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীতে যদি আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে, এই মুদ্রাটি রাজা হরিশ্চন্দ্রের মুদ্রা বলিয়া অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। এ বিষয়ে আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছি না। এতৎসম্বন্ধে ভবিষ্যতে মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণ আলোচনা করিবেন, এই আশায় আমরা মুদ্রাটির চিত্র প্রকাশিত করিলাম।

শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় তৎপ্রণীত " মুর্শিদাবাদের ইতিহাস " নামক গ্রন্থে রবিগুপ্তের একটি মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। আমাদের প্রাপ্ত মুদ্রাটির সহিত ঐ মুদ্রার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। স্থানীয় মুদ্রাতত্ত্ব-বিদগণের মতেও, ইহা পরবর্ত্তী কালের গুপ্তরাজগণের মুদ্রা। " বিক্রমপুরের ইতিহাসে " আমাদের মুদ্রার অনু-রূপ একটি মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাহাকে সেন-রাজগণের মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; কিন্তু, তাহার অনুমানের কোনরূপ কারণ লিখিত হয় নাই। মুদ্রাটি কোথায় এবং কিরূপে পাওয়া গিয়াছে তাহারও কোন উল্লেখ নাই।

রাজবাটী এবং রাজান্তঃপুরের পূর্ব্বদিকে সাগর দীঘি অবস্থিত ; তাহার পূর্ব্ব তীরে একটি বাইদ ; এবং বাইদের



হরিশ্চন্দ্রের রাজাসন।

E. B. P. & P. House, Dacca.



সাভারে প্রাপ্ত ইষ্টকনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি।



সাভারে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত ইষ্টক

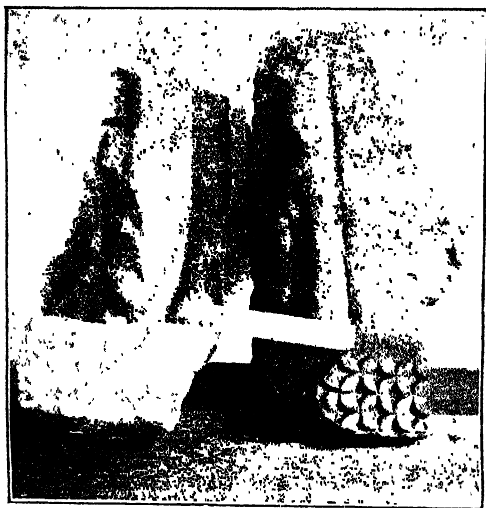
E. B. P. & P. House, Dacca.

পূর্ব্বদিকে রাজাসনের ভিটা অবস্থিত। এই স্থানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের (এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় এবং উত্তরাধিকারী রাজা দামোদরের) বহির্ব্বাটী ছিল। এইস্থানে রাজ সিংহাসন স্থাপিত ছিল বলিয়া ইহার নাম রাজাসন হইয়াছে। রাজাসনের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে কুমইরা দীঘি অবস্থিত। ৪। ৫টি স্তূপ মাত্র এখন রাজাসনের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান। [চিত্র দ্রষ্টব্য] তন্মধ্যে দুইটি স্তূপ কৃষকগণের নির্দ্দয় হল-চালনে ভূমির সহিত প্রায় সমতল হইয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর পরে কেবল বিক্ষিপ্ত ইষ্টক রাশি ভিন্ন এই স্তূপসমূহের কোন চিহ্নই বর্ত্তমান থাকিবে না। হল-কর্ষণ-কালে বহু প্রস্তর ও ইষ্টক মূর্ত্তি এবং নানাবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত ইষ্টক কৃষকগণ প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে প্রাপ্ত তিন খানা খোদিত ইষ্টক কর্ণপাড়া নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক প্রাপ্ত হন। উহার মধ্যে একখানা বুদ্ধ মূর্ত্তি মাত্র ঢাকা সাহিত্য পরিষদে সযত্নে রক্ষিত আছে। [চিত্র দ্রষ্টব্য] রাজাসনে প্রাপ্ত অপর একখানা বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত ইষ্টক রোয়াইল জমীদার বাড়ীতে রক্ষিত ছিল। জমীদার শ্রীযুক্ত লাবণ্য মোহন রায়, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত অমূল্য মোহন রায়, এম, এ, বি এল, মহাশয় দ্বয় উক্ত ইষ্টক খণ্ড লেখককে প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। [চিত্র দ্রষ্টব্য] ইষ্টক খানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত মধ্যে আটখানা বুদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত ছিল। পাঁচ খানা মূর্ত্তি বেশ স্পষ্ট আছে। অপর তিনখানা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধ মূর্ত্তি গুলি বিভিন্ন প্রকার আসন-বদ্ধ।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক মূর্ত্তি কৃষকগণের তাচ্ছিল্য বশতঃ বিনষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাজাসনে বহু খোদিত ইষ্টক পাওয়া যায়। চেষ্টা করিয়া আমরাও তাহার কয়েক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি। [চিত্র দ্রষ্টব্য]। (দক্ষিণ দিকের ক্ষুদ্র খোদিত ইষ্টকখানা পূর্ব্ব বর্ণিত গণক-পাড়ায় প্রাপ্ত; অপর তিনখানা সাভার রাজাসনে প্রাপ্ত। স্থানাভাবে মাত্র তিনখানা ইষ্টকের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল; এরূপ বহু ইষ্টক লেখকের নিকট সংগৃহীত আছে।) এই সমস্ত কারুকার্য্যখোদিত ইষ্টকসমূহ হইতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়ের স্থাপত্যের উন্নতির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এই রাজাসনে অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা দুইখানা ভগ্ন ইষ্টক-লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। আশা করি, তদ্দ্বারা হরিশ্চন্দ্রের তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধার হইবে। যথা স্থানে তাহার বিবরণ লিখিতে হইবে।

রাজাসনের পশ্চিমে ও উত্তরে দুইটি বাইদ্ দৃষ্ট হয়, এবং উহা রাজাসনের অদূরেই পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, উহা পূর্ব্বে কোন জলাশয় ছিল। অথবা উহা রাজ-পুরীর পরিখা চিহ্নও হইতে পারে।

সাভারের উত্তর দিকে কোট বাড়ী অবস্থিত। হিন্দু রাজত্বে সাধারণতঃ দুর্গকে কোট বলা হইত। এই কোট-বাড়ী রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুর্গ ছিল। [চিত্র দ্রষ্টব্য।] কোট বাড়ী ৫০ বিঘারও অধিক পরিমাণ ভূমি খণ্ডের উপর স্থাপিত; এই সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডে এখন নানা প্রকার



সাভারে এবং গণকপাড়ায় প্রাপ্ত কারুকার্য্য খোদিত ইষ্টক।

E. B. P. & P. House, Dacca.



হরিশ্চন্দ্রের কোটবাড়ীর প্রাকারের কিয়দংশ।

E B. P. & P. House, Dacca.

বৃক্ষ জন্মিয়াছে, এবং ইষ্টক রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত আছে। কোট বাড়ীর চতুর্দ্দিকে এখনও ১০। ১২ হাত প্রশস্ত, এবং প্রায় ১৫ হাত উচ্চ লোহিত মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ-প্রাকার দণ্ডায়মান। দুর্গ-প্রাকারের অব্যবহিত নিম্নেই পশ্চিমে বংশাই নদী, দক্ষিণে কাটাগাঙ্গ (ইহার বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে), এবং উত্তর ও পূর্ব্বে প্রায় ৩০ হাত প্রশস্ত পরিখা বর্ত্তমান। দুর্গটি চতুষ্কোণ, এবং চতুর্দ্দিকে চারিটি প্রবেশ পথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। ঐ স্থানে দুর্গ-প্রাকারে পথ পরিমিত স্থান ফাঁক আছে। দুর্গ-প্রাকারের নিম্নে বংশাই নদীতে একটি বাঁধান ঘাট ছিল! এখন তাহার কোন চিহ্নাদি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু, প্রাচীনগণ ৪০। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে উহার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়াছেন।

কোট বাড়ীর দক্ষিণ দিকস্থ প্রাকারের নিম্ন দেশ দিয়া বংশাই নদী হইতে কাটাগাঙ্গ আরম্ভ হইয়া রাজান্তঃপুর এবং সাগর দীঘির উত্তর দিক দিয়া ঘুরিয়া, প্রায় চতুষ্কোণ একটি ভূমিখণ্ডকে বেষ্টন করতঃ, কোট বাড়ীর প্রায় দুই মাইল উত্তরে পুনরায় বংশাই নদীতে যাইয়া মিশিয়াছে। ইহা দুর্গ এবং রাজধানীর কিয়দংশের চতুর্দ্দিকস্থ পরিখা, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে না। কাটাগাঙ্গ অদ্যাপি প্রায় ৪০ ফিট গভীর। কাটাগাঙ্গের ধারে ধারে প্রাকার বর্ত্তমান; কাটাগাঙ্গ খনন কালে বোধ হয় সেই মৃত্তিকা দ্বারাই এই প্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছিল! প্রাকারের বহুস্থানে ইষ্টক রাশিও দৃষ্ট

হয় ; এবং উহা ৭। ৮ ফিট প্রশস্ত, এবং ৫ ফিট উচ্চ ; স্থানে স্থানে উহা কাল-বশে অনেকটা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের ফুলবতী এবং কর্ণাবতী নাম্নী দুই মহিষী ছিলেন। উভয়ের পৃথক পৃথক বাস--ভবন ছিল। ফুলবতীর ভবন এখন ফুলবাড়িয়া, এবং কর্ণাবাতীর ভবন কর্ণপাড়া নামে খ্যাত হইয়াছে। ফুলবাড়িয়া গ্রামে এখন বহুলোকের বসতি হওয়াতে প্রাচীন চিহ্নাদি সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, এখনও তথায় হরিশ্চন্দ্র খনিত ২। ৩টি দীর্ঘিকা বর্ত্তমান ; এবং ফুল-বাড়িয়ার পার্শ্বে যে একটি শুষ্ক খালের ন্যায় দৃষ্ট হয়, বোধ হয়, উহাই ফুলবতী-ভবনের পরিখা ছিল।

সাভার হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে কর্ণাবতী-ভবন (আধুনিক কর্ণপাড়া) এখনও অবস্থিত। এস্থানে এখনও বহু প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। কর্ণাবতীর-ভবনে অবস্থান কালে রাজা তাম্বুলবাড়ীতে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেন, এবং বিশ্রামাদি করিতেন। একটি ভগ্নস্তূপ এখন তাম্বুলবাড়ীর ভগ্নাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

তাম্বুলবাড়ীর দক্ষিণে নদী-তট হইতে অনতিদূরে দোলমঞ্চের ভগ্ন স্তূপ বর্ত্তমান। বাসন্তী পূর্ণিমায় এই স্থানে দোলোৎসব হইত। মঞ্চের অধিকাংশ সমতল করিয়া বসতি হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ আনুমানিক প্রায় ২০ হাত লম্বা, ১৫ হাত প্রশস্ত, এবং ১০ হাত উচ্চ।

দোলমঞ্চের দক্ষিণে নদী-তীরে রাজ-গুরুর আশ্রম অবস্থিত ছিল। এখন তথায় বসতি হওয়াতে তাহার চিহ্নাদি বর্ত্তমান নাই; নিদর্শন স্বরূপ উহার পূর্ব্ব দিকে অদ্যাপি রাজ-গুরুর দীঘি বর্ত্তমান আছে।

তাম্বুলবাড়ীর পূর্ব্ব দিকে সেনাপাড়া নামক গ্রাম অবস্থিত। বোধ হয়, এই স্থানে সৈন্যগণের বাসস্থান ছিল, এবং ইহা হয়ত রাজধানীর পার্শ্ব রক্ষা করিবার জন্য দুর্গ ছিল। সেনাপাড়ার উত্তরে সেনাপাড়ার দীঘি অবস্থিত। সেনাপাড়ার চতুর্দ্দিকে পরিখা ছিল, তাহার সুস্পষ্ট চিহ্নাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

রাজান্তঃপুরের উত্তর দিকে নদনপুর নামক স্থান বর্ত্তমান। এই স্থানে হাট বাজার ছিল, এইরূপ কথিত হয়।

রাজাসনের দক্ষিণপূর্ব্বে একটি বিশাল প্রান্তর আছে। প্রবাদ এই, এই স্থানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের গোশালা এবং গোচারণ মাঠ ছিল। যে স্থানে গোশালা ছিল, তাহা অদ্যাপি গোপের বাড়ী, এবং তৎসন্নিকটস্থ গোচারণ মাঠ ঘাসমহাল নামে খ্যাত।

রাজাসনের নিকটে একটি স্থান পীলখানা নামে খ্যাত। এই স্থানে রাজার হস্তীশালা ছিল, এইরূপ প্রবাদ।

পীলখানার সন্নিকটে রথখোলা বর্ত্তমান। রথ যাত্রার দিন এই স্থানে রথ টানা হইত।

রাজাসন হইতে এক মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে হরিশবাগ

অবস্থিত। কথিত আছে এই স্থানে রাজার উদ্যান ছিল; এখন উহা নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

রাজাসন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে, এবং ফুল-বাড়িয়া হইতে প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বে গান্ধারিয়া গ্রাম অবস্থিত; ইহার প্রাচীন নাম গান্ধার গড়। বোধ হয়, এই স্থানে পূর্ব্বে দুর্গ ছিল। ইহা অতিশয় সুরক্ষিত; ইহার চতুর্দ্দিকে প্রায় ২০০ হাত প্রশস্ত পরিখা বর্ত্তমান। পরিখার কোনও কোনও স্থান সুগভীর, কিন্তু, অধিকাংশ স্থানই ধান্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পরিখা বেষ্টিত গান্ধারিয়া গ্রাম প্রায় দেড় মাইল ভূমি খণ্ডের উপর অবস্থিত গান্ধারিয়ার পশ্চিমাংশে রাবণ রাজার বাড়ী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই রাবণরাজা হরিশ্চন্দ্রের ভাগিনেয়-দামোদরের বংশোদ্ভুত।

রাবণ রাজার বাড়ীর পশ্চিমে ঢালিপাড়া নামক স্থানে বহু ঢালি সৈন্য বাস করিত, এইরূপ প্রবাদ। ঢালিপাড়ার উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত বাগ বাড়ীতে রাজ-পণ্ডিত-গণ বাস করিতেন।

গান্ধারিয়ার উত্তরে সাধাপুর নামক গ্রামে রজক, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, প্রভৃতি শ্রমজীবিগণ বাস করিত। তাহার নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি তথায় ধোপাখোলার পুকুর, মালী পুকুর, কুমার পুকুর, প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে।

রাবণ রাজার বাড়ীর উত্তর দিকে মানুষপোড়ার টেক (উচ্চ স্থান) দুইটি অবস্থিত। এই স্থানে পূর্ব্বে শ্মশান ছিল। ইহার নিকটেই শ্মশান কার্য্যের জন্য একটি পুষ্করিণী বর্ত্তমান।

গান্ধারিয়ার দক্ষিণে রাজকোণ্ডা নামক একটি গ্রাম আছে। ইহাও পরিখা বেষ্টিত। হরিশ্চন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণ পরবর্ত্তী কালে এইস্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ।

কোট বাড়ী হইতে ১॥০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ভাটপাড়া গ্রাম। ইহার প্রাচীন নাম ভট্টপল্লী। রাজভট্টগণ এই স্থানে বাস করিতেন, এইরূপ প্রবাদ। এস্থানেও বহু প্রাচীন দীঘিকাদি বর্ত্তমান। তাহাদের নাম পূর্ব্বেই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এই গ্রাম হইতে আমরা প্রায় ৫০ খানা প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। (২৮) সময়ান্তরে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভাটপাড়ার উত্তর পশ্চিমে চাইরা চৌমাথা নামক স্থানে চারিটি রাজ পথের সম্মিলন স্থল ছিল। ইহার নিকটেই চাইরা পুষ্করিণী। মেরিখোলা নামক স্থানে পূর্ব্বে হাট বাজার ছিল, এইরূপ প্রবাদ।

ভাটপাড়ার সন্নিকটে ছইলাকলমা নামক স্থানে রাজসৈন্যদিগকে লক্ষ্য স্থির করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত এইরূপ প্রবাদ। এখন সেস্থানে নিবিড় গজারী বন। বনের মধ্যে স্থানে স্থানে বহু ইষ্টক স্তূপ দৃষ্ট হয়।

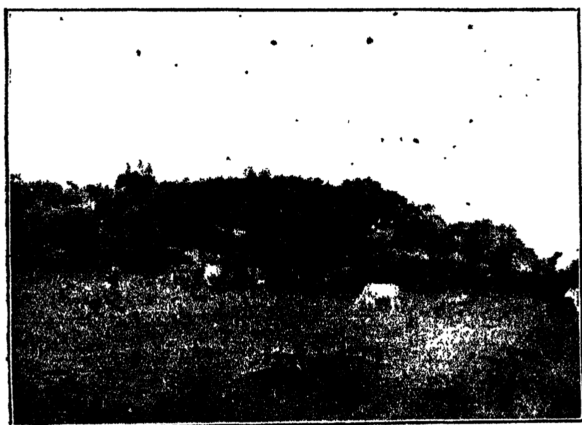
নিরামিষ দীঘি ও কাটাগাঙ্গের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, প্রায়

(২৮) ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকা মোহন অধিকারী, এবং শ্রীমান শ্যামাচরণ সরকারের চেষ্টাতেই এই গ্রন্থ সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহারা লেখকের আন্তরিক ধন্যবাদ ভাজন।

এক বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া, এবং সমভূমি হইতে প্রায় ২৫।৩০ হাত উচ্চ একটি প্রকাণ্ড মৃৎস্তূপ বর্ত্তমান আছে। ইহাকে সচরাচর বুরুজ বলা হয়। [চিত্র দ্রষ্টব্য]। স্তূপোপরি দুইটি ইষ্টকে বাঁধান কূপ দৃষ্ট হয়। একটি প্রায় ভরিয়া গিয়াছে, অপরটি এখনও ৪।৫ হাত গভীর আছে। রাজপুরীর প্রহরীগণ বোধ হয় এই বুরুজের (Tower) উপর হইতে শত্রুর আগমন লক্ষ্য করিত। কেহ কেহ বলেন, ইহা নহবৎ খানা ছিল।

সাভার এবং তৎচতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীস্থিত যে সমস্ত কীর্ত্তিচিহ্নাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহার বিবরণ আমরা উপরে সংক্ষেপতঃ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিবিড় অরণ্য মধ্যে নানাস্থানে হয়ত আরও কত অনাবিষ্কৃত ভগ্নস্তূপাদি লোক চক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত আছে।

আধুনিক রঙ্গপুর জেলার যে ধর্ম্মপাল রাজার কীর্ত্তি চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়, তাঁহার সহিত সাভার-রাজ হরিশ্চন্দ্র পালের বৈবাহিক সম্পর্কাদি বর্ত্তমান ছিল, এইরূপ প্রবাদ। এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, গৌড়ের পাল রাজবংশের দ্বিতীয় নৃপতি ধর্ম্মপাল, এবং নিম্ন বর্ণিত ধর্ম্মপাল বিভিন্ন ব্যক্তি। প্রথম ধর্ম্মপালের প্রায় দুই শত বৎসর পরে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের অভ্যুদয় হয়। বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ, চতুর্ভুজ রচিত হরিচরিত কাব্য, এবং দাক্ষিণাত্য-পতি রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় গিরি লিপিতে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নিম্নে যথাস্থানে বিশদভাবে তাহা বিবৃত হইবে।



ভাটপাড়ার বুরুজ অথবা নহবৎখানা

E. B. P. & P. House, Dacca.

রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খৃষ্টাব্দে দণ্ডভুক্তি-পতি (সম্ভবতঃ গৌর মণ্ডল) ধর্ম্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। সুতরাং, ইহা প্রমাণিত হইতেছে, যে, দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু লামা তারানাথের গ্রন্থ, এবং খালিমপুরে প্রাপ্ত প্রথম ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং, এই উভয় ধর্ম্মপালের মধ্যে দুই শতাব্দীর অধিক ব্যবধান বর্ত্তমান। গৌড়ের পাল রাজবংশের বংশাবলিতে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের নাম দৃষ্ট হয় না সম্ভবতঃ হরিশ্চন্দ্র পাল প্রভৃতির ন্যায় তিনিও পালরাজবংশের আদিশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক একটি খণ্ডরাজ্য স্থাপন করেন। ব্রহ্মপুত্রনদ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এইরূপ অনুমিত হয়। (২৯) ধর্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, ও বহু কীর্ত্তি চিহ্নাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই ধর্ম্মপাল যে পালবংশীয় নৃপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ, তাঁহার রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত একটি বহু প্রাচীন বাসুদেব মূর্ত্তিতে পালরাজগণের রাজচিহ্ন সিংহারূঢ় হস্তীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। (৩০) ঐ মূর্ত্তি সন্নিকটস্থ এক বৈরাগীর আখড়ায় পূজিত হয়।

(২৯) Montgomery Martin's "Eastern India." Vol. III. Page 406.

(৩০) J. A. Vas's "District Gazetteer of Rangpur." Page 20.

পটিকানগর-পতি মাণিক চন্দ্র কাহারও মতে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের ভ্রাতা, (৩১) এবং কাহারও মতে শ্যালীপতি (৩২) ছিলেন। মাণিকচন্দ্র মহিষী ময়নামতী এবং ধর্ম্মপাল মহিষী বনমালা (ধর্ম্ম--মঙ্গল প্রণেতা মানিক গাঙ্গুলির মতে সফুল্লা বা সাফুলা, সীতারাম ও ঘনরামের মতে সামুলা) ভগ্নী ছিলেন। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপী চন্দ্রের (দুর্ল্লভ মল্লিকের গোবিন্দ চন্দ্র, এবং চৈতন্য ভাগবতের গোপীলালের) সহিত হরিশ্চন্দ্র রাজার অদুনা এবং পদুনা নাম্নী দুহিতৃদ্বয়ের বিবাহ হয়। (৩৩) ইঁহারা ভারতবিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, ---"যে অদুনা পদুনার নাম এক সময়ে ভারত বর্ষের সর্ব্বত্র ভাট; যোগী ও চারণগণের গাথায় প্রচারিত হইত, সে দিনও বোম্বাই হইতে যাহাদের চিত্র রবিবর্ম্মা অঙ্কিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যে যে বঙ্গীয় রাজা ও তাঁহার মহিষীদের করুণ প্রসঙ্গ লইয়া এখনও অনেক নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়া থাকে, এবং উত্তর পশ্চিমে লক্ষ্মণ দাস প্রমুখ বহু-সংখ্যক কবি যাহাদের গুণ গাথা গাহিয়াছেন, এবং যাহা-দের সম্বন্ধীয় গীতি এক সময়ে বাঙ্গলা দেশ ও উড়িষ্যার

(৩১) Montgomery Martin's "Eastern India." Vol. III. Page 407.

(৩২) ধর্ম্মমঙ্গল, এবং মাণিকচন্দ্র রাজার গান

(৩৩) Montgomery Martin's "Eastern India." Vol. III. Page 407.

ঘরে ঘরে শ্রুত হইত, সেই গোপী চন্দ্র ও তাঁহার মহিষী-দ্বয়ের প্রথম প্রেম-মিলন এই সাভারেই হইয়াছিল।" (৩৪)

দুর্ল্লভ মল্লিক রচিত "গোপীচন্দ্র রাজার গান" নামক দেশ প্রচলিত পুঁথিতে মাণিকচন্দ্রের পিতৃ পিতামহের নাম পাওয়া যায়। অন্য কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাইলে উহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। যাহা হউক, আপাততঃ আমরা উহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছি। পূর্ব্বোক্ত পুঁথিতে দুইটি ছত্র এইরূপ পাওয়া যায়।

"সুবর্ণ চন্দ্র মহারাজা ধারিচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মানিকচন্দ্র শুন তার কথা।"

এই দুই ছত্র হইতে মাণিকচন্দ্রের পিতৃপিতামহের নাম পাওয়া যাইতেছে।

মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। সুতরাং, মাণিকচন্দ্রের তেজস্বিনী পত্নী ময়নামতীর সহিত ধর্ম্মপালের রাজ্যঘটিত গোলযোগ এবং মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তাহার ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র সসৈন্যে জামাতার সাহায্যার্থ উপস্থিত হন। ত্রিস্রোতা অথবা তিস্তা নদী--তীরে যুদ্ধে হরিশ্চন্দ্র বোধ হয় নিহত হন। কারণ, এইস্থানে এই যুদ্ধে নিহত না হইলে স্বরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রের এইস্থানে প্রাণ ত্যাগ সম্ভব পর বলিয়া বোধ হয় না। যুদ্ধস্থলের অদূরেই

(৩৪) প্রবাসী। আষাঢ়, ১৩১৯।

হরিশ্চন্দ্রের সমাধিস্থান দৃষ্ট হয়। দেওনাই নদী তীরে অবস্থিত ময়নামতীর দুর্গ এবং বাসভবন হইতে বহু দক্ষিণে, এবং রামগঞ্জের পূর্ব্বদিকস্থ চড়চড়া গ্রামে "হরিশ্চন্দ্র পাট" নামে খ্যাত একটি প্রায় বৃত্তাকার স্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহাই হরিশ্চন্দ্রের সমাধিস্থান, এইরূপ প্রবাদ। এই স্তূপ খনন করাতে মৃত্তিকা নিম্নে একটি গৃহাংশ দৃষ্ট হয়। এখন তাহার নিম্ন ভাগ মাত্র বর্ত্তমান। যে প্রস্তর বাঁধান গর্ত্ত দৃষ্ট হয়, তাহার উপরিভাগ ১৩ ফিট এবং নিম্নদেশ ৮ ফিট প্রশস্ত। পার্শ্বের প্রস্তরখণ্ডগুলি এরূপ ভাবে সজ্জিত যে, উভয় দিকেই দুইটি সিঁড়ি নিম্ন-দিকে নামিয়া গিয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। ইহা যে কাহারও সমাধি স্থান, তাহা দর্শন মাত্রেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং উহা হরিশ্চন্দ্রের সমাধি-মন্দির এইরূপ জন-প্রবাদে অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। (৩৫)

ধর্ম্মপালের মৃত্যু অথবা পরাভবের পর গোপীচন্দ্র অথবা গোবিন্দচন্দ্র সিংহাসনারূঢ় হন। প্রবাদ এই, ইনি মাতার উপর রাজ-কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া এক শত স্ত্রীর সহিত বিলাসিতায় মগ্ন হন। কিন্তু, ইঁহার মাতৃ-গুরু হাড়ি-সিদ্ধার উপদেশে শীঘ্রই ইঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হয়, এবং গোপীচন্দ্র উক্ত যোগীর সহিত সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, তিনি অদ্যাপি বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। গোপীচন্দ্রের এই অদ্ভুত জীবন কাহিনী অদ্যাপি রঙ্গপুর অঞ্চলে এবং এমন

---

(৩৫) Montgomery Martin's "Eastern India."

কি কামরূপ প্রভৃতি স্থানেও "শিবের" গীত অথবা "মাণিক চাঁদের" গীত আখ্যায় ইতর সাধারণ কর্ত্তৃক সোৎসাহে গীত হইয়া থাকে। গ্রীয়ারসন এই "মাণিক চাঁদের গীত" সংগ্রহ করিয়া, বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনা করিয়াছেন, এবং এমন কি ইহাকে 'Epic of Rangpur' আখ্যা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। (৩৭)

উক্ত গ্রাম্য গীতির আখ্যায়িকা ভাগ আমরা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদান করিতেছি।

মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতী তান্ত্রিক প্রক্রিয়াদিতে অত্যন্ত পারদর্শিনী ছিলেন; তাঁহার গুরু হাড়িসদ্ধা প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন যোগী পুরুষ ছিলেন। মাণিকচন্দ্র বহু দিন অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজ্য শাসন করেন; পরে এক জন দক্ষিণদেশী (বাঙ্গালী) দেওয়ান নিযুক্ত করাতে তাঁহার অত্যাচারে প্রজাগণ প্রপীড়িত হইয়া বিদ্রোহী হয়; এবং এই বিদ্রোহ দমনেই মাণিকচন্দ্র প্রাণ ত্যাগ করেন। সতী-প্রথা অনুসারে ময়নামতী জ্বলন্ত চিতায় মৃত স্বামীর অনুগমন করিলেন, কিন্তু অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাঁহার একগাছি কেশও দগ্ধ করিল না। তাঁহার মৃত্যু দেবগণের বাঞ্ছিত নহে জানিয়া ময়না চিতা হইতে অবতরণ করিলেন। ইহার ১৮ মাস পরে তাঁহার পুত্র গোপীর জন্ম হয়; এই অস্বাভাবিক দীর্ঘ কাল গর্ভবাস পুত্রের

(৩৭) The song of Manik chandra. J. A. S. B. Vol XLVII (1878). P. 135.

ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের নিদর্শন। ময়নামতী যথা সময়ে সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয় অদুনা ও পদুনার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে এক শত পরিচারিকা আগমন করে। ময়না আধ্যাত্মিক ক্ষমতার সাহায্যে জানিতে পারেন যে, অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে, পুত্র গোপীচন্দ্র অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হইবেন। মাতার চেষ্টায় পুত্র নবীন যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অরণ্যবাসী হইলেন। মাতৃগুরু হাড়িসিদ্ধা অরণ্যে তাঁহার সহগামী হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে অদুনা পদুনার বিলাপ এবং স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনুনয় এবং নানাবিধ যুক্তি প্রয়োগ গ্রাম্য গীতিতে অতি মর্ম্মগ্রাহী ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

'মাণিক চাঁদের গান' হইতে এই অংশ নিম্নে এবং, গ্রীয়ারসন্ কৃত তাহার মর্ম্মগ্রাহী ইংরেজী অনুবাদ পাদ টীকায় উদ্ধৃত হইল।

" না যাইও না যাইও রাজা দুর দেশান্তর।
কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দীর ঘর॥
বান্দিলাম বঙ্গলা ঘর নাহি পাড় কালী।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমায় বৃথা গাবুরালী॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
দস গিরির মা ও বইন রবে স্যানি লইবে কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিরে॥

খালী ঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘা।
বয়স কালে যুবতী বাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও।
আমাকে সঙ্গে করি লইয়া যাও॥
জীয়ব জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রাঁধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে॥
পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী॥
আইল পাতার দেখিলে কথা কহিয়া যামু।
গিরি লোকের বাড়ী গেলে গুরু শ্যাম বলিমু॥
সিতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালিসে হেলান পাও।
হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও॥
হাত খানি দুঃখ হইলে পাও খানি যাতিমু।
এ রঙ্গর কৌতুকর বেলা স্মৃতি ভুল্লিমু এ স্মৃতি ভুল্লাইমু॥
গ্রীস কালে বদনত দিমু দণ্ড পাখার বাও।
মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও॥ (৩৮)

(৩৮) "Nay, nay, my kingto distant lands thou shalt not fare

Nor desolate the life that breathes for thee alone.

Few are my years, no grey yet mingles with my hair:

Will widow me, my lord, before my bride-hood's done?

"In dreams thy face will haunt me, and my arms close pressed will seek to hold thee.

দুর্লভ মল্লিক রচিত "গোবিন্দচন্দ্র রাজার গান" হইতে এই অংশের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"অভাগী উদুনারে রাজা সঙ্গে করি লহ।
দেশান্তরে যাব আমি কর অনুগ্রহ॥
তুমি যোগী হবে আমি হইব যোগিনী।
রান্ধিয়া বিদেশে যোগাইব অন্ন পানি॥
বসিয়া থাকিহ তুমি বনের ভিতরে।
আনিব মাগিয়া ভিক্ষা আমি ঘরেঘরে॥
নগরে নগরে ভ্রমি বসিবে যখন।
তৃষ্ণা হলে জল আনি কে দিবে তখন॥
বনে বনে কাঁটা ভাঙ্গি জ্বালিব আগুনি।
সুখেতে বঞ্চিব নিশি যোগীয়া যোগিনী॥
সর্ব্ব দুঃখ পাশরয়ে নারী যার পাশে।
আমারে করিয়া সঙ্গে চল দেশে দেশে॥
না ছাড়া না ছাড়া মোরে বঙ্গের গোসাঞি।
তোমা বিনে উদুনা থাকিবে কোন ঠাঞি॥
নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ।
শিব বটে যোগীয়া ভবানী তার সঙ্গ॥"

Ev'n the poorest wife and bride upon her bosom bends her master's head to rest:

Shall sorrow be my mate and love unsatisfied ?

"The voice of scandal ne'er hath spared a widow's fame ;

গোপীচন্দ্রের অরণ্য- যাত্রার পূর্ব্বে পুত্রের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষিণী ময়নামতী অগ্নিতাপে ফুটন্ত তৈলপূর্ণ কটাহে অনায়াসে নিমজ্জিত হইয়া, অক্ষতশরীরে পুনরায় পুত্রের মঙ্গলার্থে নানাপ্রকার প্রক্রিয়াদি করেন।

Therefore, beloved, if thou goest, I go with thee!

In hunger, and in thirst, oh king, my care thou 'lt claim,

The night I will beguile with song and poesy.

"In summer's heat, a palm-leaf fan shall still thy sighs.

Against thy breast I'll nestle close, when cold winds blow.

And holy Indra's joy—the lap of five score [illegible]es—

Alone I'll give, with thee beloved, let me go.

Now am I young and comely, worthy of a king.

Will youth and beauty stay or suffer to be tied

'Gainst thy return? My banian tree, to thee I cling

A helpless creeper—Bide with me, my husband, bide."

অরণ্যবাস-কালে একদা গোপীচন্দ্র গঞ্জিকা ক্রয় করিবার জন্য হাড়িসিদ্ধাকে ১২টি কড়ি দিতে প্রতিশ্রুত হন। প্রতিশ্রুত অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ গোপীচন্দ্র অগত্যা হীরা নাম্নী জনৈকা বারাঙ্গনার নিকট দ্বাদশ বর্ষের জন্য আত্মবিক্রয় করেন। প্রণয়প্রার্থিনী হীরা গোপীচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া, প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায়ে তাঁহার দ্বারা অতি হীন এবং কষ্টদায়ক কার্য্যাদি করাইত, এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রহার করিত। অবশেষে হাড়িসিদ্ধা তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া হীরা এবং তাহার পরিচারিকাকে তাহাদের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। হীরাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার উর্দ্ধাংশ বাদুড়, এবং নিম্নাংশ মৎস্যরূপে পরিণত করেন; এবং দুঃশীলা পরিচারিকাকে তাহার বৃদ্ধ বয়সে এক দুর্বৃত্তের নিকট বিবাহ দেন; এবং সে উহাকে প্রত্যহ নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিত।

বহু কাল পরে গোপীচন্দ্র পুনরায় রাজধানীতে, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত রাজ্য পুনর্গ্রহণ করিয়া কর হ্রাস করিয়া প্রজাদিগকে সুখী করেন। "মাণিকচন্দ্রর গীতে" পটিকানগরে গোপীচন্দ্রের রাজধানী অবস্থিত ছিল, এইরূপ উল্লেখ আছে। ধর্ম্মপালের রাজধানী হইতে এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত পটকপাড়া ও উল্লিখিত পটিকানগর অভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। (৩৯)

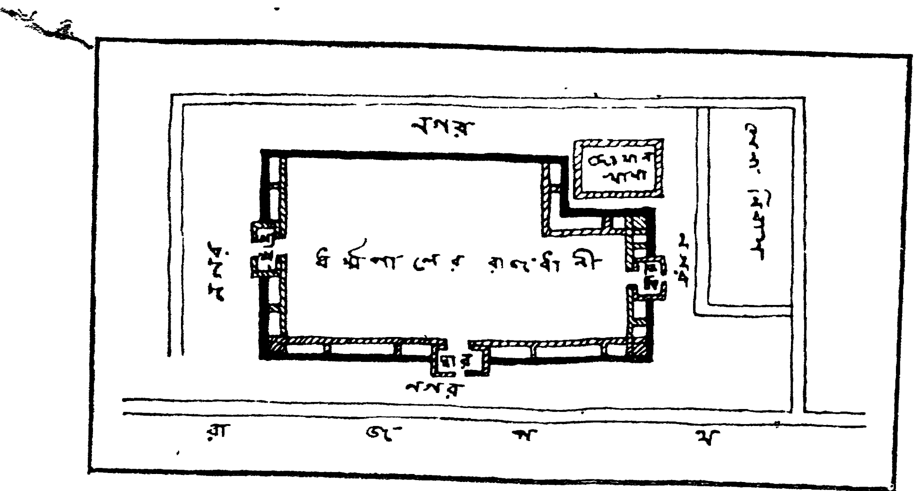
(৩৯) Babu Bisweswar Bhattacharya in the J. A. S. B. vol. vi. March, 1910.

গোপীচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহর পুত্র ভবচন্দ্র অথবা হবচন্দ্র সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার অপর নাম উদয়-চন্দ্র হইতেই তাঁহার রাজধানীর নাম উদয়পুর হইয়াছিল। বাঘদ্বার পরগণাস্থিত এই রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখন নিবিড় বনাচ্ছাদিত। বহু বর্ষ পূর্ব্বে বুকানন এই স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্ন স্তূপ, এবং উদ্যানাভ্যন্তরস্থ পথাদির সুস্পষ্ট চিহ্নাদি দর্শন করিয়া তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা একটি পথের দুই পার্শ্বস্থিত দুই শ্রেণী দীর্ঘিক মাত্র দৃষ্ট হয়।

ভবচন্দ্র একদা কোন নিষিদ্ধ সময়ে রাজ-প্রতিষ্ঠিত দেবী-মন্দিরে গমন করাতে দেবীর অভিশাপে তাঁহার বুদ্ধি লুপ্ত হয়, এইরূপ প্রবাদ। ভবচন্দ্রের নির্ব্বুদ্ধিতা দেশবিখ্যাত। "ভবচন্দ্র (হবচন্দ্র) রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী" ছিলেন। এত দুভয়ের নির্ব্বুদ্ধিতাজ্ঞাপক পুকুর চুরি প্রভৃতি বহু কৌতুকাবহ প্রচলিত গল্প প্রত্যেক বঙ্গবাসীর নিকট সুপরিচিত। এই নির্ব্বোধ রাজার রাজত্ব-কালেই বোধ হয় রঙ্গপুরের পাল-রাজত্বের অবনতির সূত্রপাত হয়। ভবচন্দ্রের পরেও অপর এক জন তদ্বংশীয় রাজার রাজত্বের বিষয় আমরা অবগত আছি, কিন্তু তাঁহার নাম অজ্ঞাত। কেণবংশীয় নীলধ্বজ এই নৃপতিকেই পরাজিত করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন, এবং ধরলা নদীর পূর্ব্বতীরে কোচবেহার-রাজ্যান্তর্গত কমাৎপুর নামক স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন।

অনুসন্ধানে রঙ্গপুরে আমরা পূর্ব্বোক্ত চারি জন পাল-বংশীয় নৃপতির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নে ইঁহাদের রাজধানী, দুর্গ, এবং প্রতিষ্ঠিত নগর প্রভৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত ডিমলার কিঞ্চিৎ নিম্নে তিস্তা নদীর যে প্রকাণ্ড বাঁক দৃষ্ট হয়, তাহার প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে ধর্ম্মপাল রাজার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। [চিত্র] নগরটি চতুষ্কোণ, উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এক মাইল, এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত। নগরের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ প্রাকার দণ্ডায়মান। প্রাকারের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে দেওয়ান থানার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উত্তর দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকস্থ নগর—প্রাকারের অব্যবহিত নিম্নেই প্রায় ৪০ ফিট প্রশস্ত একটি পরিখা, কিন্তু নগরের পূর্ব্ব দিকে এই পরিখা কিংবা প্রাকারের মধ্যে কোন প্রবেশ-পথ দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত তিন দিকের প্রাকার এবং পরিখার ঠিক মধ্যস্থলে প্রতিদিকে এক একটি প্রবেশ পথ। ঐ সকল প্রবেশ-দ্বারের নিকট বহু পরিমাণে ইষ্টক দৃষ্ট হয়, এবং উহা যে সুরক্ষিত ছিল তাহার চিহ্নাদি সুস্পষ্ট। প্রাকারের প্রত্যেক কোণে, এবং মধ্যেও বহু স্থানে চতুষ্কোণ মিনার (bastion) ছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ; এবং বোধ হয় ঐ মিনার-সমূহ হইতে প্রহরীগণ দূর হইতেই শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিত। উত্তর, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিকের পরিখা হইতে প্রায় তিন শত হাত দূর নগর-প্রাকারের সমান্তরাল ভাবে



ধর্ম্মপালের রাজধানীর আনুমানিক মানচিত্র।

E. B. P. & P. House, Dacca.

ন্যের একটি প্রাকার এবং পরিখা দৃষ্ট হয়। নগরের বহির্ভাগে নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ বাস করিত; এবং এই বহির্ভাগস্থ নগরের চতুর্দ্দিকেই এই প্রাকার এবং পরিখা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরের দক্ষিণদিকস্থ বহিঃপ্রাকারেরও বহির্দ্দেশে রাজার অশ্বশালা ছিল; তাহারও চিহ্নাদি বর্ত্তমান। নগরের পশ্চিম দিকস্থ প্রাকারের প্রায় ৩০০ হাত ব্যবধানে উহার সমান্তরাল ভাবে একটি উচ্চ এবং সুপ্রশস্ত পথ উত্তর-দক্ষিণে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বোধ হয়, উহা নগরের পশ্চিমদিকস্থ বহির্ভাগের বহিঃপ্রাকার ছিল। নগরের প্রায় ১ মাইল উত্তরপশ্চিমে ধর্ম্মপাল-খনিত চন্দনপাট নামক একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে। সান্নিকটবর্ত্তী আরও নানা স্থানে বহু দীঘিকা দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত নগরের সুরক্ষিত অবস্থিতি দর্শনে মনে হয় ঐ স্থানে ধর্ম্মপালের দুর্গ ছিল। রাজা দুর্গ মধ্যে না থাকিয়া, ঐ স্থান হইতে প্রায় ½ মাইল দূরে, এবং হস্তীঘোষ নামক একটি ক্ষুদ্র নদীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অবস্থিত রাজপুরীতে থাকিতেন; এখন সেখানে পুরীর ভগ্নাবশেষ কয়েকটি ক্ষুদ্র ইষ্টকস্তূপ, দীঘিকা, এবং চতুষ্কোণ একটি ইষ্টকবহুল বৃহৎ মৃৎস্তূপ মাত্র বর্ত্তমান। শেষোক্ত স্তূপটির নাম 'ফকির মোল্লা তের কাজি'; মুসলমান রাজত্বে ২৫ জন ফকিরের নামে উহা উৎসৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া উহার এরূপ নাম হইয়াছে এইরূপ প্রবাদ। স্থানের মুসলমান আখ্যা সত্ত্বেও কোন মুসলমান রাজপুরী অথবা দুর্গের

সীমামধ্যে বাস করিতে সাহস করে না; তত্রত্য সমু
অধিবাসীই হিন্দু।

ধর্ম্মপালের পর গোপীচন্দ্রের রাজধানী দেওনাই নদীর পশ্চিম তটে, এবং ধর্ম্মপালের দুর্গের প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল; ময়নামতীও এই স্থানে বাস করিতেন। এই দুর্গ, প্রাসাদ প্রভৃতি ঠিক ধর্ম্মপালের দুর্গাদির অনুরূপ। গোপীচন্দ্রের নগর আনুমানিক ৪০০ গজ লম্বা, এবং ৩০০ গজ প্রশস্ত; এবং উহা হইতে প্রায় ১০০ গজ দূরে নগরের বহিঃপ্রাকার দণ্ডায়মান। ধর্ম্মপাল, অথবা গোপীচন্দ্র কাহারও রাজধানীতেই ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের চিহ্নাদি পাওয়া যায় না। রঙ্গপুর জেলার মধ্যে এইরূপ বহু স্থানে ধর্ম্মপাল এবং তাঁহার বংশধরগণের বহু কীর্ত্তিচিহ্নাদি বর্ত্তমান। কিন্তু এই প্রবন্ধে তাহার বিশদ বিবরণ প্রদান করিলে প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাইবে, এই আশঙ্কায় তাহার অবতারণা করিলাম না।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রসঙ্গে আমরা ধর্ম্মপাল এবং তদ্বংশীয়গণের বিবরণও প্রদান করিয়াছি। কথঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আশা করি, ইহা পাঠকগণের নিকট বিরক্তিকর হইবে না। যাহা হউক আমরা পুনরায় আমাদের পূর্ব্ব প্রসঙ্গে উপস্থিত হইতেছি।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের লিখিত বংশাবলী সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উহার উপর বিশেষ ... আস্থা স্থাপন করা যায় না, তাহা আমরা পরে দেখাইব। পাঙ্গারিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়ের

সাহায্যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পীযুষ কিরণ চক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্রের বংশধর গণের যে বিবরণ আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন নিম্নে আমি তাহা যথাযথ বিবৃত করিলাম।

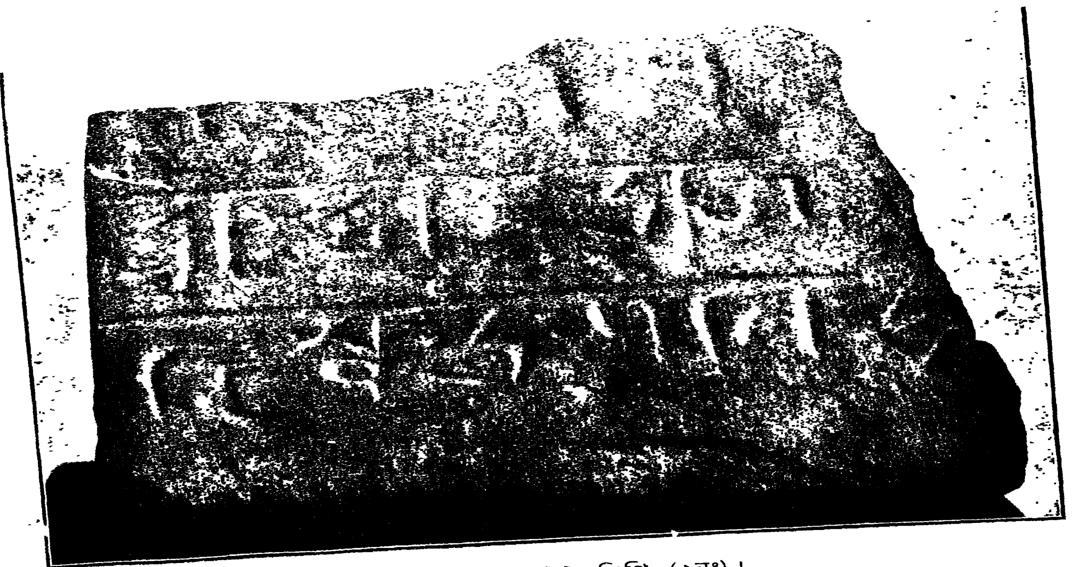
হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁহার কোন পুত্রসন্তান না থাকাতে, তাঁহার ভাগিনেয় দামোদর (দামু রাজা) রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইনি হরিশ্চন্দ্রের ভগ্নী রাজেশ্বরী দেবীর (রাজি দেবীর) পুত্র। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্ব বর্ণিত রাজাসন তাঁহারই প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ।

হরিশ্চন্দ্র হইতে অধস্তন দশম পুরুষ শিবচন্দ্র নানা তীর্থ দর্শন করিয়া ভারত ভ্রমণ করেন। ইনি অতি বিদ্যোৎসাহী ও পরম ভক্ত ছিলেন। শিবচন্দ্রের পরে রাজ-বংশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। বিশাল রাজধানীর অধিকাংশ পতিত ও বনাকীর্ণ হইয়া যাওয়াতে, রাজ-বংশীয়েরা সর্ব্বেশ্বর নগর পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী কোণ্ডা, গঙ্গোদিয়া, কান্দুলিয়া প্রভৃতি স্থানে বসতি করিতে থাকেন। শিবচন্দ্রের একাদশ অধস্তন পুরুষ তরুরাজ খাঁ মুসলমান রাজত্বে হুগলীর ফৌজদারের সহযোগী পদে নিযুক্ত হইয়া খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। শুভরাজ, যুবরাজ, বুদ্ধিমন্ত ও ভাগ্যবন্ত, তরুরাজের এই চারি পুত্র। শুভরাজ ও যুবরাজ পিতার সহিত হুগলীতে বাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা সেই দেশেই থাকেন। তাঁহাদের বংশধরেরা সোণাবাড়ীর চৌধুরী উপাধি ধারণ করিয়া সোণাবাড়ীয়া গ্রামে বাস করিতেন। বুদ্ধিমন্ত রায় ও ভাগ্যবন্ত রায় নবাব-সরকারে কার্য্য করিতেন। যবন-

সংস্রব-দোষে জাতিপাত হওয়াতে ভাগ্যবন্ত রায় দেও ত্যাগ করেন। তিনি 'খন্দকার' নামে পরিচিত হন, এবং তাঁহার সমাধিস্থান অদ্যাপি 'খন্দকারের দরগা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোণ্ডা গ্রামে তাঁহার নামানুসারে একটি পল্লীর নাম ভাগ্যবন্তপাড়া হইয়াছে। এই বংশের যশোবন্তরায় ঢাকার দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ইতিহাসে সুপরিচিত। পূর্ব্বোল্লিখিত বংশাবলী অনুসারে শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায় এখন হরিশ্চন্দ্রের বংশধর।

আমরা গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯১২) ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টায় যখন সাভারে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহু স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন এক দিন সাভারের রাজাসন দর্শন কালে তত্রত্য জনৈক কৃষকের নিকট হইতে একখানি খোদিত ইষ্টক-লিপি সংগ্রহ করি। [চিত্র দ্রষ্টব্য] ইহার কয়েক দিন পরেই আমার জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু উক্ত রাজাসন হইতেই সংগৃহীত অপর এক খানা ইষ্টক লিপি আমাকে প্রেরণ করেন। [চিত্র দ্রষ্টব্য]। উভয় ইষ্টক-লিপিই বাংলার আভাসযুক্ত দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। এই ইষ্টক-লিপিদ্বয়ের সাহায্যে আশা করি, সাভারের লুপ্ত ইতিহাস কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্ধার হইতে পারে।

প্রথমোক্ত ইষ্টকলিপিখানা অতি বৃহৎ একখানি ইষ্টকের উপর খোদিত ছিল, তাহা দর্শন মাত্রই প্রতীয়মান হয়। বোধ হয় ইহাতে ৪ পংক্তি লিপি খোদিত



সাভারে প্রাপ্ত খোদিত ইষ্টকলিপি (১নং)।

B. P. & P. House Dacca



সাভারে প্রাপ্ত খোদিত ইষ্টকলিপি (২নং)।

E. B. P. & P. House, Dacca.

ছিল। কিন্তু ইহার প্রায় অর্দ্ধাংশ ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে, প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তির শেষ অক্ষর 'প'টি বেশ সুস্পষ্ট আছে। প্রথম ইষ্টক-লিপিখানার নিম্নলিখিত রূপ পাঠোদ্ধার হইয়াছে।

* * * প

শ্রীশ্রীমদ্রাজ

রিশ্চন্দ্র পাল দ * *

দ্বিতীয় পংক্তির 'প'টি বোধ হয় "অধিপ" শব্দের শেষ অক্ষর। প্রথম দুই পংক্তিতে বোধ হয় হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য এবং রাজধানীর পরিচয় ছিল।

দ্বিতীয় ইষ্টক-লিপিখানার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই লিপিখানার প্রত্যেকটি পংক্তির উপরে ও নীচে সুন্দর খোদিত কারুকার্য্য বর্ত্তমান।

এই লিপিখানাতে কয় পংক্তি ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন,—তবে উহাতে দুইটি পংক্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। বোধ হয়, উহার উপরে ও নীচে আরও কয়েকটি পংক্তি ছিল। দ্বিতীয় ইষ্টক-লিপিখানার নিম্নলিখিত রূপ পাঠোদ্ধার হইয়াছে।

"* * বত ১২৫৪

* * * পুরী"

এই 'বত' শব্দের পুর্ব্বে নিশ্চই 'সং' শব্দ ছিল, এবং 'পুরী' শব্দের পুর্ব্বে হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীর নাম ছিল।

এই ইষ্টক-লিপিদ্বয়ের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি প্রমাণিত হইতেছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র পালবংশীয় নৃপতি ছিলেন। (তৃতীয় পংক্তির ভগ্ন শেষ অক্ষরটি নিঃসন্দেহ 'হ' ছিল) 'পাল' শব্দের পর যে অর্দ্ধভগ্ন 'দ'টি দৃষ্ট হয় উহা বোধ হয় 'দে', এবং তাহার পর একটি 'ব' ছিল। এই 'দেব' শব্দ জাতি-সূচক নহে; প্রত্যেক নৃপতির নামের পরেই এই সম্মানসূচক উপাধি সংযুক্ত থাকে। হরিশ্চন্দ্র পালবংশীয় নৃপতি, এবং কোন পালবংশীয় নৃপতিই মাহিষ্য-জাতীয় ছিলেন বলিয়া জানা যায় না, সুতরাং রাজা হরিশ্চন্দ্র পালকেও মাহিষ্যজাতীয় অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই।

দ্বিতীয় ইষ্টকলিপিখানা হরিশ্চন্দ্রের নামযুক্ত না হইলেও, তাঁহার বাসভবনের ভগ্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া যাওয়াতে, উহা তাঁহার কোন বংশধরের, এইরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। এই ইষ্টক-খণ্ডে খোদিত তারিখে (১২৫৪ সংবতে) সাভারে কোন নৃপতি রাজত্ব করিতেন, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। এ বিষয় মীমাংসার জন্য, এবং হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব-কাল স্থির করিবার জন্য আমরা হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনার আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আধুনিক রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত পটিকানগরের রাজা মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র অথবা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের

অদুনা-পদুনা নাম্নী কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হয়। সুতরাং ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, জামাতা গোবিন্দচন্দ্র যে সময়ে পটিকানগরে রাজত্ব করিতেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই হরিশ্চন্দ্র সাভারে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। জামাতার সিংহাসন লাভের জন্যই ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধে হরিশ্চন্দ্র নিহত হন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্ভুক্ত তিরুমলয় গিরিলিপিতে তামিল ভাষায় মহারাজ রাজেন্দ্র-চোল দেবের যে দিগ্বিজয়-কাহিনী বর্ণিত আছে পাদটীকায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল। (৪০)

---

৪০ 'In the 13th year (of the reign) of King Para Kesori Varman alias the lord Sri-Rajendra Chol-Deva, who ....seized by (his) great, warlike army (the following)... ..Odda-vishaya which was difficult to approach, (and which he subdued in) close fights ; the good Kosalainadu, where Brahmans assembled ; Tandabutti, in whose gardens bees abounded, (and which he acquired) after having destroyed Dharma Pal (in) a hot battle ; Takkanaladam, whose fame reached (all) directions, (and which he occupied) after having forcibly attacked Ranasura ; Vangaladesa, where the rain wind never stopped, (and from which) Govinda chandra fled, having descended from his male elephant ; elephants of rare strength and treasures of women, (which he seized after having been pleased to put to flight on a hot battle-field Mahipala, decked

ইহা হইতে জানা যায় যে, রাজেন্দ্রচোল দেব ওড্ড-বিষয়, এবং কোশলনাডু দেশ যুদ্ধে অধিকার করিয়াছিলেন, এবং তক্তবুত্তি অথবা তন্তভুক্তিপতি ধর্ম্মপাল, তক্কণলাড়ম্পতি রণশূর, বঙ্গালদেশপতি গোবিন্দচন্দ্র, এবং উত্তারলাড়ম্পতি মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। (৪১)

(as he was) with ear-rings, slippers and bracelets; Uttiraladam, as rich in pearls as the ocean; and the Ganga, whose waters dashed against bathing-places covered with sand.' Hultzech's "South Indian Indian Inscriptions" vol 1.

(৪১) ওড্ডবিষয় = উড়িষ্যা (গৌড় রাজমালা, ৪০ পৃঃ)
কোশলনাডু = কোশল দেশ (?)

তন্তবুত্তি = তন্তভুক্তি বা বিহার, সম্ভবতঃ গৌড়মণ্ডল (শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু—শূন্যপুরাণ)

বঙ্গাল দেশ = বঙ্গদেশ (শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, এবং গৌড়-রাজমালা)

তক্কন লাড়ম্ = উত্তর রাঢ় (শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু এবং গৌড় রাজমালা)।" রায় বাহাদুর বেঙ্কয় এবং ডাক্তার হুল্‌জ "তক্কণ লাড়ম্" দক্ষিণ বিরাট বা দক্ষিণ বেরার অর্থে এবং উত্তরিলাড়ম্ উত্তর বেরার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।"

"কিন্তু, ওড্ডবিষয় (উড়িষ্যা) বঙ্গাল দেশ (বঙ্গ) গঙ্গার সহিত উল্লিখিত দেখিয়া "লাড়" কে রাঢ় অর্থে গ্রহণই সমীচীনতর বোধ হয়।" গৌড়রাজমালা ৪০ পৃঃ, পাদ টীকা।

প্রথম রাজেন্দ্রচোল দেব ১০১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয় তাহার অনতিপরেই পূর্ব্ব ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিরুমলয়-গিরিলিপি তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে, অর্থাৎ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। রাজেন্দ্রচোল দেবের রাজত্বের নবম বর্ষে উৎকীর্ণ মেলপাড়ির চোলেশ্বর মন্দির-লিপিতে পূর্ব্ব ভারতের দিগ্বিজয়-কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই, অথবা পূর্ব্বোক্ত নৃপতি এবং দেশসমূহেরও কোনরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। (৪২) সুতরাং ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, রাজেন্দ্রচোল দেবের রাজত্বের নবম হইতে ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ ১০২০ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি পূর্ব্ব ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং ঐ সময়ে বিহারপতি ধর্ম্মপাল, উত্তর রাঢ়পতি মহীপাল, দক্ষিণ রাঢ়পতি রণশূর, এবং বঙ্গদেশপতি গোবিন্দ চন্দ্র দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

তিরুমলয় গিরিলিপিতে উল্লিখিত বৎসরের যাথার্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নে আমরা আরও প্রমাণ উল্লেখ করিলাম। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সারনাথে ভূগর্ভ হইতে একটি বুদ্ধ মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। তাহার পাদপীঠে প্রথম মহীপালদেবের একটি প্রস্তরলিপি খোদিত

(৪২) Epigraphia Indica Vol. VII—Appendix. List of Inscriptions of Southern India.

আছে। তাহাতে "সংবৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে ১১" অতি স্পষ্টাক্ষরে খোদিত। (৪৩) ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ১০৮৩ সংবতে অর্থাৎ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে মহীপালদেব জীবিত ছিলেন। সুতরাং তিরুমলয় গিরিলিপি অনুসারে ১০২০ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজেন্দ্রচোল দেব কর্ত্তৃক মহীপালদেবের পরাজয় বার্ত্তায় অবিশ্বাস্য কিছুই নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাজা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন। মাণিকচন্দ্র মহিষী ময়নামতী পুত্র গোবিন্দ চন্দ্রের সিংহাসন লাভের জন্য ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ করেন। জামাতা গোবিন্দচন্দ্রকে সাহায্য করিবার জন্য সাভার নৃপতি হরিশ্চন্দ্র পালদেব সেই যুদ্ধে যোগদান করেন এবং সম্ভবতঃ যুদ্ধেই নিহত হন।

সুতরাং, হরিশ্চন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রাণ ত্যাগ করেন। তিরুমলয় লিপি অনুসারে গোবিন্দচন্দ্র ১০২০ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, এবং যুদ্ধে রাজেন্দ্রচোল দেবের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই (একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে) হরিশ্চন্দ্রপাল দেব সাভারসিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, রামাই পণ্ডিত রচিত "শূন্য পুরাণে"

---

(৪৩) গৌড় লেখমালা। প্রথম ভাগ।

বহু স্থানে হরিশ্চন্দ্র অথবা হরিচন্দ্র রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"হরিশ্চন্দ্র রাজা। করে ধর্ম্ম পূজা
ভরএ নবাহুতি ঘর।"

* * * * *

হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্ম পূজার বর্ণনায় কবি পুনরায় গাহিয়াছেন,—

"চন্দ্র সূর্য্য আদি ক গ্রহ-তারাগণ।
ধন্য হরিশ্চন্দ্র ধন্য আমরা ভুবন॥"

* * * * *

"হরিশ্চন্দ্র মহারাজা রাজা রাণী করে পূজা
হরিজন ধর্ম্ম জুগ পতি।"

* * * * *

"শূন্যে পূজএ হরিচন্দ্র বিসাদ ভাবিআ মতি।"

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

"শূন্য পুরাণের" মুখবন্ধে প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নানাবিধ যুক্তিতর্ক দ্বারা, রামাই পণ্ডিতের বর্ণনানুযায়ী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং তৎসাময়িক ধর্ম্মের ইতিহাস অতি বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপাল এবং হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক ব্যক্তি। বাহুল্য জ্ঞানে সেই সমস্ত আলোচনার পুনরবতারণা করা হইল না। বসু মহাশয় বিশিষ্ট প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, রামাই

পণ্ডিত দশম শতাব্দীর শেষ পাদে, অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং রামাই পণ্ডিতের সমসাময়িক হরিশ্চন্দ্রও ঐ সময়ে রাজত্ব করিতেন, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ-বলে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, রামাই পণ্ডিতের আবির্ভাব বিচারেও উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে।

বসু মহাশয় মুখবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "রাজা হরিশ্চন্দ্র বা হরিচন্দ্রকেও আমরা রামাই পণ্ডিতের সমসাময়িক লোক বলিয়া মনে করি। * * কিন্তু, তিনি কোন স্থানের রাজা ছিলেন তাহা জানা যায় না।" সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের সম্বন্ধে অতি অল্প দিন হইল আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং "শূন্যপুরাণের" মুখবন্ধ লিখিবার সময় হয়ত বসু মহাশয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ অবগত ছিলেন না, এবং তজ্জন্যই এইরূপ লিখিয়াছেন। "শূন্যপুরাণ" বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রই যে সাভারের হরিশ্চন্দ্র তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, ঐ সময়ে আবির্ভূত অন্য কোন হরিশ্চন্দ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। মছলি সহরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়, গাহড়বাল-রাজ হরিশ্চন্দ্র দেব ১২৫০ সংবতে, অর্থাৎ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। (৪৪) কিন্তু সাভারের হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব কাল একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। সুতরাং প্রায় দুই শত বৎসরের ব্যবধান

(৪৪) Epigraphia Indica. Vol. X part v.

থাকাতে এতদুভয় হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে গোলযোগের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। এতদ্ভিন্ন, রামাই পণ্ডিতের বর্ণনানুযায়ী হরিশ্চন্দ্র যে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এবং শূন্যবাদী ছিলেন, তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন অদ্যাপি সাভারে পাওয়া যায়। সাভারে রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত কতিপয় বুদ্ধ মূর্ত্তির বিবরণ ও চিত্র পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। সাভারে অনুসন্ধান কালে আমরা কয়েকখানা বহু পুরাতন হস্তলিখিত "ধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থ, এবং, বোধ হয়, "শূন্যপুরাণের" অতি জীর্ণ ৩।৪ খানা মাত্র পৃষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হরিশ্চন্দ্রের সময় সাভার অঞ্চলে ধর্ম্ম পূজার এবং শূন্যবাদের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। "শূন্য পুরাণের" মুখবন্ধে প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সহদেব চক্রবর্ত্তী রচিত "ধর্ম্ম মঙ্গলের" উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাহাতে "হরিচন্দ্র" বা হরিশ্চন্দ্র 'রাজার ধর্ম্ম-নিন্দা, অপুত্রক হেতু মহিষী সহ রাজার বন-গমন, তাঁহার নানা দেবদেবীর উপাসনা, বন-মধ্যে রাজার পিপাসায় প্রাণত্যাগ, রাণীর ধর্ম্মস্তুতিতে ধর্ম্মের অনুগ্রহ, রাজার প্রাণলাভ এবং পুত্রলাভ, ধর্ম্মের ছলনায় পুত্র-বলিদান, এবং পুনরায় তাঁহার কৃপায় পুত্রের প্রাণ লাভ,' প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণিত আছে। কিন্তু, আমাদের সংগৃহীত "ধর্ম্মমঙ্গলে" ইহার কোনরূপ উল্লেখ নাই। অপর এক প্রবন্ধে এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বসু মহাশয়ই অপর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—পর-

বর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ ধর্ম্মের জন্য হরিশ্চন্দ্রের পুত্র-বলিদানের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু শূন্যপুরাণে এ প্রসঙ্গ নাই। পরবর্ত্তী কবিগণ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ পুত্র-বলিদানের প্রসঙ্গ যোগ করিয়া থাকিবেন।

তৃতীয়তঃ, চতুর্ভুজ-রচিত "হরি চরিত কাব্যে" লিখিত আছে—

" গ্রামোত্তমো হস্তামলনঞ্জু ভুতৈক পুঞ্জঃ।
শ্রীমান করঞ্জ ইতি বন্দ্যতমো বরেন্দ্র্যাম্॥
* * * * * *
কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ,
শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরো হবতীর্ণঃ॥
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং।
জগ্রাহ শাসনবরং নৃপ ধর্ম্মপালাৎ॥" (৪৫)

অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমে করঞ্জনামে এক শ্রেষ্ঠ গ্রাম আছে, এই গ্রামে বিপ্রপ্রবর স্বর্ণরেখ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ধর্ম্মপালের নিকট হইতে তিনি উক্ত সমগ্র গ্রামখানি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি যে, স্বর্ণরেখ আমাদের বর্ণিত ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং স্বর্ণরেখের তারিখ স্থির করিতে পারিলে তৎসঙ্গে ধর্ম্মপালের এবং তৎসঙ্গে তাহার সমসাময়িক (তিরুমলয় লিপি অনুসারে) গোবিন্দচন্দ্রের, এবং তৎসঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের শ্বশুর

(৪৫) হরি চরিত কাব্য। ১৩শ স্বর্গ।

সাভারপতি হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব-কালও স্থিরীকৃত হইবে। এতদুপায়ে প্রাপ্ত তারিখ এবং পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে প্রাপ্ত তারিখের ঐক্য হইলে, আমাদের সিদ্ধান্ত বল-বত্তর হইবে।

বারেন্দ্র কুলগ্রন্থমতে, বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রের বীজ-পুরুষ সুষেণ আদিশূরের সভায় উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং, তিনি আদিশূরের সমকালবর্ত্তী। হরিচরিত কাব্যোল্লিখিত স্বর্ণরেখ বীজ-পুরুষ সুষেণ হইতে অধ-স্তন দশম পুরুষ। (৪৬) সুতরাং, আদিশূরের সময় নির্ণীত হইলে তৎসঙ্গে স্বর্ণরেখের সময়ও নির্ণীত হইবে।

আদিশূরের সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বহু মতামত লক্ষিত হয়। কুলার্ণবের মতে ৮৫৪ শকে ("বেদবাণা-ঙ্কমে শাকে"); "বারেন্দ্রকুলপঞ্জীর" মতে ("শাকে বেদ কলঙ্কষট্‌ক বিমিতে"), এবং বাচস্পতি মিশ্রের মতে ("বেদ বাণাঙ্ক শাকে") ৯৫৪ শকে; ভট্টগ্রন্থমতে ৯৯৪ শকে। "শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ

---

(৪৬) বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রের বীজপুরুষ সুষেণ, তৎপুত্র ব্রহ্মা ও তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎ-পুত্র শান্তনু মহামুনি, তৎপুত্র জীগনি (জীবন), তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র হিরণ্যগর্ভ, তৎপুত্র বেদগর্ভ, এই বেদগর্ভের পুত্র স্বর্ণরেখ। সুতরাং, স্বর্ণরেখ সুষেণের ১০ম পুরুষ অধস্তন হইয়াছেন।"—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শূন্য পুরাণ, মুখবন্ধ।

যদা। অঙ্কে অঙ্কে বামাগতি বেদযুক্তে তদা॥ কন্যা-গত তুলাঙ্ক অঙ্কে গুরুপূর্ণ দিনে।); "ক্ষিতীশ বংশাবলির" মতে ৯৯৯ শকে ("নবনবত্যাধিক নবশতী শকাব্দে"); "কায়স্থ কৌস্তুভ" রচয়িতার মতে ৩৮০ বাংলা সনে, অর্থাৎ ৮১৪ শকে; "দত্তবংশমালার" মতে ৮০৪ শকে ("শাকে সবেদাষ্ট শতাব্দকে" ; "Indo-Aryans" গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ৮৮৬ শকে; "সম্বন্ধ নির্ণয়ের" মতে ৯৯৯ সংবতে, অর্থাৎ ৮৬৪ শকে; "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" রচয়িতার মতে ৯৫৪ শকে;" (৪৭) "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসুর মতে ৬৭৫ হইতে ৬৭৭ শকের মধ্যে; "গৌড়রাজমালা"র মতে আনুমানিক ৯৮২ শকে (১০৬০ খৃষ্টাব্দে) আদিশূর গৌড় মণ্ডলে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই বিভিন্ন মতাবলীর মধ্যে কোনটি প্রকৃত পক্ষে গ্রহণীয়, তাহা স্থির করিতে গেলে মস্তক বিঘূর্ণিত হয়। যাহা হউক, নিম্নে আমরা এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের "Indo-Aryans" গ্রন্থে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বীর-সেন ও আদিশূরকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন।

৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করাই আমরা সমীচান বোধ করি। কারণ, (১) প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার কুলগ্রন্থে "বেদবাণাঙ্ক শাকে" [৬৫৪ শকাব্দে] আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আন-

য়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা"র মতও ইহার অনুকূল। তাহাতেও "শাকে বেদকলঙ্কষট্‌ক বিমতে" [৬৫৪ শকাব্দে] আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, "পালবংশীয় রাজা দেবপালের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আদিশূর আবির্ভূত হইয়াছিলেন"। (৪৮) দেবপাল ৮৪৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৭৬৬ শকাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। (৪৯) সুতরাং হরিমিশ্রের উক্তিও আমাদের মতের অনুকূল।

(৩) বারেন্দ্রগণের লাহেড়ী বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, পালবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি ধর্ম্মপাল সুপ্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝাকে ধামসার গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুথমমরধুনী তীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞি বিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং স কনক-রজতৈর্ধাম সারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ
পুণ্যকামঃ" ॥ (৫০)

---

(৪৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। প্রথম খণ্ড ৯৮পৃঃ।

(৪৯) V. A. Smith—"Indian Antiquary" Vol. XXXVIII.

(৫০) লাহেড়ী বংশাবলী।

এই আদিগাঞি ওঝা আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের একতম শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশের পৌত্র। ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ। ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝা।

তৎসুতশ্চ ক্ষিতীশঃ স আগতো গৌড়মণ্ডলে।
ভট্টনারায়ণস্তস্মাৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
তৎপুত্রাঃ ভুবিবিখ্যাতাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতাঃ॥
আদ্যো বরাহ বাটুশ্চ রামো লালো নিপোস্তথা।"(৫০)

এরূপ স্থলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ধর্ম্মপালের অন্ততঃ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আদিগাঞি ওঝার পিতামহ ক্ষিতীশ কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে আনীত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল ৭৮০ খৃষ্টাব্দে, ৭০২ শকাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। (৫২) সুতরাং ইহা হইতেও অর্থাৎ ৭০২—৫০=৬৫২ শকাব্দ পাইতেছি, এবং এতদ্দ্বারা আমাদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সমর্থিত হইতেছে।

(৪) কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য ৬৯৫ হইতে ৭৩২ খৃঃ [৬১৭ হইতে ৬৫৪ শকাব্দ] পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার দিগ্বিজয় কালে তিনি যাইতেছে; কান্যকুব্জ পতি যশোধর্ম্মকে [ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ এই যশোবর্ম্মার সভা শোভিত করিয়া ছিলেন] পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং গৌড় রাজ্য

---

(৫১) হরিমিশ্র।

(৫২) V. A. Smith Indian Antiquary Vol. XXXVIII.

অধিকার করিয়াছিলেন। (৫৩) গৌড় রাজ্যের তৎকালীন নৃপতির নাম "রাজতরঙ্গিণী"তে উল্লিখিত নাই। ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াদিত্য (জয়াপীড়) ৬৬৬ হইতে ৬৯৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই পিতামহের ন্যায় তিনিও দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। নানাদেশ জয় করার পরে রণক্লান্ত সৈন্য এবং সামন্ত নৃপতিগণকে স্বদেশ গমনে অনুমতি প্রদান করিয়া তিনি একাকী গৌড় রাজ্যে এবং ক্রমে সমৃদ্ধিশালী গৌড় রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করেন। গৌড়ে তখন জয়ন্ত নামক জনৈক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। (৫৪) নানারূপ ঘটনার পর জয়াপীড় জয়ন্তের একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং দিগ্বিজয়ী জামাতা অচিরে পঞ্চগৌড়ের রাজগণকে পরাজিত করিয়া শ্বশুরকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিলেন। (৫৫) হরিমিশ্ররচিত প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকায় এবং অন্যান্য বহু কুলগ্রন্থে আদিশূর "পঞ্চগৌড়াধিপ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীর বর্ণ-

---

(৫৩) "রাজ তরঙ্গিণী"। চতুর্থ তরঙ্গ।

(৫৪) গৌড় রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা॥
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্।

রাজ তরঙ্গিণী। চতুর্থ তরঙ্গ।

(৫৫) ৪১৮ হইতে পরবর্ত্তী শ্লোকাবলী দ্রষ্টব্য।

রাজ তরঙ্গিণী। চতুর্থ তরঙ্গ।

নায় এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থাদির বর্ণনায় ঐক্য দর্শনে, এবং প্রায় সমকালবর্ত্তী হওয়াতে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় জয়ন্ত এবং আদিশূরকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। জামাতার সাহায্যে "পঞ্চ-গৌড়াধিপ" হইয়া, বোধ হয় জয়ন্ত আদিশূর উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তৎসাময়িক অন্য কোন নৃপতি "পঞ্চগৌড়াধিপ" ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং রাজতরঙ্গিণীর এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থাদির বর্ণনার পরস্পর সামঞ্জস্য করিবার জন্য জয়ন্ত এবং আদিশূরকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করা অযৌক্তিক নহে। ৭৫৪ শকে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া, তাহার ১৪।১৫ বৎসর পরে জয়ন্ত আদিশূর বৃদ্ধকালে জয়াপীড়কে কন্যাদান করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক। এই অনুমান সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে, ৬৫৪ + ১৫ = ৬৬৯ শকাব্দ প্রাপ্ত হইতেছি। এই তারিখের সহিত রাজতরঙ্গিণী বর্ণিত জয়াপীড়ের দিগ্বিজয়ের তারিখের সম্পূর্ণ ঐক্য হওয়াতে আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে।

(৫) আদিশূর যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধস্তন প্রায় পঞ্চদশ পুরুষগণকে আদিশূরের দৌহিত্র বংশে জাত বল্লালসেন (৫৬) কৌলিন্য প্রদান করেন। (৫৭) সুতরাং, আদিশূর

---

(৫৬) "জাতো বল্লালসেনো গুণিগণিতস্তস্য দৌহিত্র-বংশে।" বারেন্দ্র কুলপাঞ্জিকা।

(৫৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।" প্রথম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ।

বল্লাল সেন হইতে আনুমানিক ১৫×২৫—৩৭৫ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বল্লাল সেন ১০৯১ শকে "দান-সাগর" গ্রন্থ, (৫৮) এবং ১০৯০ শকে "অদ্ভুত সাগর" গ্রন্থ (৫৯) রচনা করেন। "অদ্ভুত সাগরে" এক স্থানে লিখিত আছে, —"ভুজ-বসু দশ মিতে শকে শ্রীমদ্ বল্লাল সেন রাজ্যাদৌ" ইত্যাদি। ইহাতে ১০৮১ শকাব্দ বল্লাল সেনের রাজত্বের প্রথম বৎসর রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (৬০) ১০৬০ শকের আনুমানিক ৩৭৫ বৎসর পূর্ব্বে যদি আদিশূর বর্ত্তমান থাকিয়া থাকেন, তবে এতদ্দ্বারা ৭০৬ শকাব্দ তাঁহার আবির্ভাবকালরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও, ইহা আমাদের সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। আনুমানিক গণনায় যথার্থ সময় নিরূপণ করা সুঠিন, এবং তাহাতে এইরূপ সামান্য ব্যবধান হওয়া স্বাভাবিক।

পূর্ব্বোক্ত এই সকল যুক্তির বলে, ৬৫৪ শকাব্দেই আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের সময় নির্দ্দিষ্ট করা

---

(৫৮) নিখিল চক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেনেন পূর্ণে
শশি-নব-দশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ
বল্লালসেন রচিত "দানসাগর"। J. A. S. B. 1896.

(৫৯) "শাকে খ-নব-খেন্দ্বব্দে। Bhandarkar's Report on the search for Sanskrit manuscripts during 1887—88, and 1890-91

(৬০) Babu Manomohan Chakravarty: J. A. S. B. 1906.

আমরা সমীচীন বোধ করি। যাহা হউক, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে, দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল স্বর্ণরেখ নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে করঞ্জ গ্রাম দান করেন; সুতরাং স্বর্ণরেখ ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ব্যক্তি। স্বর্ণরেখ আদিশূরানীত বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রের বীজ পুরুষ সুষেণ হইতে অধস্তন দশম পুরুষ, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ২৫ বৎসর এক পুরুষের আনুমানিক কাল ধরিয়া লইলে, স্বর্ণরেখ আদিশূরের সমসাময়িক সুষেণ হইতে ২৫০ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ৬৫৪ শকে আদিশূর ব্রাহ্মণানয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং, স্বর্ণরেখ, এবং তৎসঙ্গে দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল, এবং তৎসঙ্গে (তিরুমলয় লিপি অনুসারে) গোবিন্দচন্দ্র ৬৫৪ +২৫০=৯০৪ শকাব্দে, অর্থাৎ, ৯৮২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের শ্বশুর সাভারপতি হরিশচন্দ্র পালদেব ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ, খৃষ্টিয় দশম শতাব্দীর শেষপাদে বর্ত্তমান ছিলেন, বর্ত্তমান যুক্তিতে এইরূপই প্রতীয়মান হইতেছে। ইতিপূর্ব্বেও, নানা-প্রকার যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হরিশ্চন্দ্র খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ পাদে, অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং, এই যুক্তি তাহার পোষকতাই করিতেছে।

চতুর্থতঃ, গ্রীয়ারসন্ মাণিকচন্দ্র (গোবিন্দ চন্দ্রের পিতা এবং হরিশ্চন্দ্রের বৈবাহিক) খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা

করিয়াছেন। (৬১) কিন্তু, আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি, তাহাতেই গ্রীয়ারসনের অনুমান অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। মাণিকচন্দ্র যে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে, অর্থাৎ, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ইহাও উক্ত হইতে পারে যে, "মাণিকচন্দ্রের গানে" কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের কথা লিখিত আছে।

"মাণিক চাঁদ রাজা বঙ্গে বড় সতি।
হাল খানায় মাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কাড়॥
দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজানা যোগায়।
তার বদলী ছয় মাস পাল খায়॥"

এইরূপ কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের প্রথা হিন্দু-শাসন কালে প্রচলিত ছিল। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে মাণিকচন্দ্র এবং তৎসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র মুসলমান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই প্রসঙ্গে পরে লিখিয়াছেন, "এই পুস্তক ("বঙ্গভাষা ও সাহিত্য") পাঠ করিয়া মান্যবর গ্রীয়ারসন সাহেব আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এখন তিনি মাণিকচন্দ্র রাজার গান মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বিরচিত বলিয়া মনে করেন।

যাহাহউক, বহু আলোচনার পরে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, সাভারপতি হরিশ্চন্দ্রপালদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ পাদ, অথবা, খুব সম্ভবতঃ, একা-

---

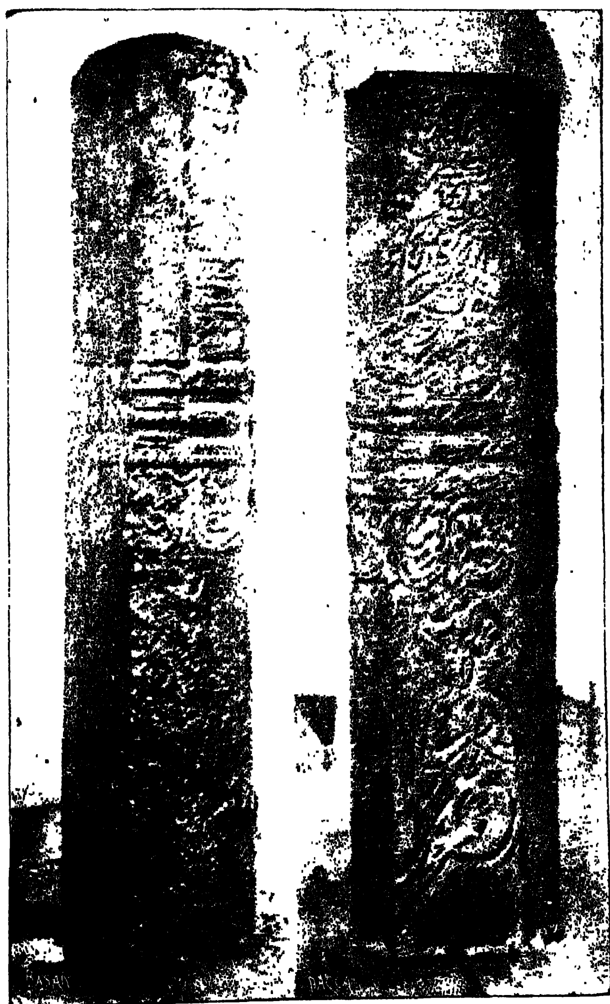
(৬১) J. A. S. B. Vol. XLVII. 1878

দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সাভারে আগমন করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। কোন স্থান হইতে তিনি সাভার আগমন করেন, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে, ইহাই অনুমিত হয় যে, গৌড়ের পালবংশীয় দ্বিতীয় বিগ্রহ-পালদেবের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে বারেন্দ্র ভূমি যখন "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির" করতলগত (৬৩) "অনধিকারী" কাম্বোজ (নেপাল) বাসীগণ কর্ত্তৃক বিজিত দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যখন গৌড় রাষ্ট্রের কোনও নিভৃত কোণে, মগধে অথবা মিথিলায় লুক্কায়িত; গৌড়ের এই মহাবিপদের সময়ে চন্দেল্ল-রাজ যশোবর্ম্মার উত্তরাধিকারী ধঙ্গদেব ১০০২ খৃষ্টাব্দে অঙ্গ ও রাঢ় আক্রমণ করিয়া সমগ্র দেশ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন ; (৬৪) গৌড়ের পালরাজবংশের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন সকলেই নিরাশ হইয়া

---

(৬৩) দীনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাণগড় অথবা বাণনগরের বিশাল ভগ্নস্তূপ হইতে সংগৃহীত, এবং দীনাজপুরের রাজবাটীর উদ্যানে পরিরক্ষিত একটী প্রস্তর-স্তম্ভের পাদদেশে "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির" শিবমন্দির উৎসর্গমূলক কয়েক পংক্তি লিপি উৎকীর্ণ আছে।—গৌড়রাজমালা। ৩৫ পৃঃ।

(৬৪) খাজুরাহাতে প্রাপ্ত ১০০২ খৃষ্টাব্দের একখানা শিলালিপিতে বঙ্গের এই বিজয়-কাহিনী বর্ণিত আছে। Sir A. Cunningham's "Archœological Survey of India." Vol. XXI.



শাকাসর স্তম্ভ।

E. B. P. & P. House, Dacca.

পড়িয়াছিলেন, খুব সম্ভবতঃ তখনই হরিশ্চন্দ্র গৌড় ত্যাগ করিয়া সাভারে আগমন করিয়া একটি খণ্ডরাজ্য স্থাপন করেন।

পালরাজবংশ যখন ধ্বংসোন্মুখ, তখন রাজবংশধরগণ পূর্ব্ববঙ্গের জলবেষ্টিত সুরক্ষিত স্থানসমূহে প্রস্থান করেন, (৬৫) তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র গৌড় হইতে আগমন করিয়া সাভারে রাজ্য স্থাপন করেন, দেশপ্রচলিত এই প্রবল কিংবদন্তীও আমাদের উক্তির সমর্থন করিতেছে।

হরিশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্য বোধ হয় ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ টোগলক্ কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় কালে মুসলমানের করতলগত হয়।

পরিশিষ্ট

বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত এবং আংশিক প্রকাশিত হইবার পর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীযুক্ত এচ্, ই, ষ্টেপ্লটন্ মহোদয় গত ডিসেম্বর মাসে (১৯১২ খ্রীঃ অঃ) আমাকে সংবাদ দেন যে ভাওয়ালের অন্তর্গত শাকাগর গ্রামে একটি প্রস্তর স্তম্ভ পতিত আছে, এবং লোকে তাহাকে মাধব আখ্যা প্রদান করিয়া মধ্যে মধ্যে পূজা করিয়া থাকে।

(৬৫) Journal & Proceedings of the A. S. B. (New Series) Vol. VII. No. 11.

শাকাগরের এই মাধবের বিষয় পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সংবাদ দাতৃগণ তাহাকে বিষ্ণু মূর্ত্তি বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন। সচরাচর যে রূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপই একটি, এই বিবেচনায় আমি ইতি পূর্ব্বে উহা দেখিতে যাই নাই।

শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ মহোদয়ের সংবাদ দানের অব্যবহিত পরেই আমি ঐ গ্রামে গমন করি। স্তম্ভটী এখন যেস্থানে পতিত আছে, তাহার সন্নিকটে বহু পুরাতন দুইটী দীঘিকা দৃষ্টহয়। শীতকাল বলিয়া উভয় দীঘিকাতেই জলে অনতি গভীর। দীঘিকাগর্ভে বহু পুরাতন বৃক্ষাদি জন্মিয়া উহাদের প্রাচীনত্বের সম্যক পরিচয় প্রদান করিতেছে। চতুর্দ্দিকস্থ সমুচ্চ তীর ভূমিও উহাদের বৃহদায়তনের পরিচায়ক। দীঘিকাদ্বয় এবং স্তম্ভটি সম্বন্ধে কোনরূপ প্রচলিত জনশ্রুতির সন্ধান পাইলাম না। স্মরণাতীত কাল হইতে স্তম্ভটিকে মাধব জ্ঞানে গ্রামবাসীগণ পার্ব্বণাদিতে তৈল সিন্দূর প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকে।

শুনিলাম কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে কোনও মুসলমান ফকির হিন্দু পূজিত এই প্রস্তর খণ্ডকে নিকবর্ত্তী নদীতে নিক্ষেপ করে। হিন্দুগণও ইহাতে উত্তেজিত হইয়া ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের সাহায্যে ফকীরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। কার্য্যটি নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া ঢাকার নবাব বাহাদুর স্বীয় ব্যয়ে হিন্দু দ্বারা প্রস্তরটিকে পুনরায় নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া সংস্কারাদি করাইয়া দেন। তদবধি প্রস্তরের মহিমা হিন্দুর নিকট আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

প্রস্তরটি স্তম্ভের উপরিভাগ মাত্র, নিম্নভাগ হয়ত নিকটেই কোথাও ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। অন্য কোনও স্থান হইতে উহা ঐস্থানে আনীত হইয়াছে এরূপ অনুমিত হয় না, কারণ, উহা এত ভারী, যে উহা স্থানান্তরিত করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। স্তম্ভটী Sandstone নির্ম্মিত, এবং অষ্টকোণ, স্তম্ভগাত্রে নানারূপ মূর্ত্তি বর্ত্তমান, কিন্তু কোনও লিপি দৃষ্ট হইল না। হয়ত উহার অনাবিষ্কৃত নিম্নভাগে কোনরূপ লিপি থাকিতে পারে। শীর্ষদেশে আট দিকে আটটী মূর্ত্তি খোদিত আছে; মূর্ত্তিগুলির ধ্যানাসন, মস্তকে কিরিট, পদনিম্নে পদ্ম। মূর্ত্তিগুলির নিম্নে কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপিয়া কারুকার্য্য খোদিত আছে, কিন্তু, তাহার প্রত্যেকটী অংশই এক একটী নৌকার ন্যায়। উহা কোন রাজচিহ্ন কি না, স্থির করিতে পারিলাম না। স্তম্ভগাত্রে আরও নানা স্থানে বোধ হয় নানারূপ মূর্ত্তি প্রভৃতি অঙ্কিত ছিল, কিন্তু, তাহা এতই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, প্রায় কিছুই দৃষ্ট হয় না। যে মূর্ত্তিগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহাও Magnifying glass দ্বারা দেখিলে কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হয়। অত্যন্ত প্রাচীন না হইলে খোদিত মূর্ত্তিগুলি এরূপভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে না। ঢাকা জেলার অধিকাংশ প্রাচীন স্থান দর্শন করিয়াছি, কিন্তু, অন্য কুত্রাপি প্রস্তরস্তম্ভ আছে কি না জানি না। যদিও এই স্তম্ভের সময় নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন, তথাপি ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা উল্লেখযোগ্য। স্তম্ভটি বৌদ্ধযুগের তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই,—খোদিত বৌদ্ধ মূর্ত্তিসমূহ হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে

পালরাজগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, হয় ত ইহা তাঁহাদেরই কাহারও কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ধামরাই গ্রামের সহিত অশোকের ধর্ম্মরাজিকার কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা তদ্বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ধামরাই গ্রাম শাকাগর হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। অশোকস্তম্ভের সহিত এই স্তম্ভের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। আমি এবিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছিনা। আশা করি, ভবিষ্যতে ইহার নিম্নভাগ আবিষ্কৃত হইলে স্তম্ভটীর কাল নির্দ্ধারণের সুবিধা হইবে।

স্তম্ভটী ভাওয়ালের শ্রদ্ধাস্পদ কুমার বাহাদুরের জমীদারীর মধ্যে পতিত আছে, সুতরাং, উহা তাঁহার সম্পত্তি। তিনি কৃপাপূর্ব্বক লেখককে উহা দান করিয়া উহা স্থানান্তরিত করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীর নিকট তদনুযায়ী আদেশ পত্রও প্রেরণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। স্তম্ভটী স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিলে বহু গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া তাহাদের আপত্তি জানায়। এতগুলি ধর্ম্মব্যক্তির প্রাণে আঘাত দেওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া স্তম্ভটি স্থানান্তরিত করা হয় নাই। পরন্তু, উহা ঐ স্থানেই যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত শীঘ্রই করিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।
